জাগ্রতা ভগবতী

ভারতনারীর জাগৃতিসূচক কথা-চিত্র

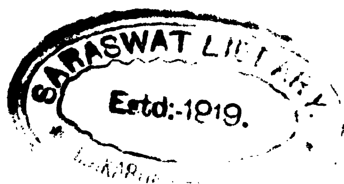
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেড় টাকা

মাঘ, ১৩৪৪

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা



উৎসর্গ

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর

শ্রীচরণকমলে

স্নেহধন্য দীন পুত্রের

ভক্তি অর্ঘ্য

উপহার

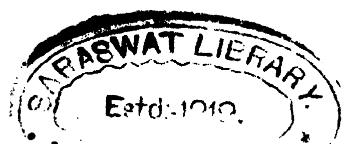
পরিচয়

মাসিক বসুমতী, উত্তরা, ভারত প্রভৃতি পত্রে এই কথাচিত্রগুলি চিত্রিত হইয়া সাহিত্য-রসিকদের প্রশংসা পাইয়াছিল।

আজ সেইগুলি প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তিত হইয়া "জাগ্রতা ভগবতী"রূপে প্রতিমায় রূপান্তরিত হইল।

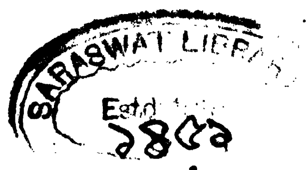
১৭নং ফেরিঘাট রোড,
আলমবাজার পোঃ,
কলিকাতা

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়



জাগ্রতা ভগবতী

সন্ধ্যা



এক

ভাগলপুর ষ্টেশনের প্লাটফরমে হঠাৎ দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ। একজন ট্রেণ হইতে নামিতেছিল; অন্যজন সেই ট্রেণেই তাহার এক আত্মীয়কে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল।

চোখো-চোখি হইতেই দুইজনের মুখেই বিস্ময়োল্লাসের ভাব ফুটিয়া উঠিল। যে ট্রেণ হইতে এইমাত্র নামিয়াছে, সে-ই প্রথমে প্রশ্ন করিল,—হিমাদ্রি! তুমি—এখানে?

আত্মীয়টিকে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া যে ফিরিতেছিল, তাহার নাম হিমাদ্রি। সে হাসিয়া উত্তর দিল,—এভাবে এখানে আমাকে দেখতে পাওয়া কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় নয়, কেননা—আমার 'ডেরা' এখানেই। কিন্তু তুমি যে হঠাৎ এই ট্রেণ থেকে এখনি লোটা-কম্বল নিয়ে নামবে—আমি তা কল্পনাও করি নি, অপরেশ! কাযেই আমার বিস্ময়টাই বেশী।

দুজনেই আমরা সমান বিস্মিত! এই আকস্মিক দেখার কল্পনাও মিনিট তিনেক আগে কারো মনে আসে নি। কত দিন পরে দেখা—ভাবত! বছর দশেক হবে না?

তা হবে বই কি! হারিসন-রোডের 'প্যারাডাইস' মেস থেকে ছাড়াছাড়ির দিনটা এখনো মনে পড়ে। তুমি গেলে বোটানিক্যাল-গার্ডেনের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে—

আর তুমিও না ঠিক সেই দিনটিতেই ঢাকার কি একটা জমিদারী-ষ্টেটের কায নিতে যাত্রা সুরু করেছিলে?

একটা অস্বাভাবিক হাস্যোচ্ছ্বাসে প্লাটফরমের যাত্রিদিগকে সচকিত করিয়া হিমাদ্রি উত্তর দিল,—যাত্রা সুরু করেছিলাম সেইদিনই সত্য, কিন্তু বন্ধু, ঢাকায় নয়—ভাগলপুরে। তোমাকে বিদায় দিয়ে ঢাকায় রওনা হবার আয়োজন করছি, এমন সময় এল এক জরুরী তার; তুমি জান কি না মনে নেই, ভাগলপুরে আমার এক মামা থাকতেন,—মস্ত জমিদার, টাকার কুমীর; হঠাৎ কলেরায় তাঁর একমাত্র পুত্র মারা পড়েছে এবং তাঁকে নিয়েও টানা-হেঁচ্‌ড়া চলেছে—অতএব আমার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।—এই সমাচার সে দিনের সেই জরুরী টেলিগ্রাম বহন করে আনে। নিয়তির দেখ কি মজার নির্ব্বন্ধ! কোথায় যাচ্ছিলাম—ইষ্টবেঙ্গলের এক অপরিচিত টাউনে, দেড়শো টাকা মাইনের এক চাকরীর আশায়,—হঠাৎ যাত্রার পথ পরিবর্ত্তন হয়ে যাওয়ায়, আমার-উপর-চিরবীতস্পৃহ-মামার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকার—আরব্য-রজনীর গল্পের মত আমারই হাতে এসে পড়ল! বুঝতেই পারছ, সেই রোগেই মামা টেঁসে গিয়েছিল এবং আমি ভিন্ন আর কেউ তাঁর এষ্টেটের ওয়ারিসন ছিল না।

বিপুল আনন্দের উচ্ছ্বাসে অপরেশের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া গেল,—দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে বলিয়া উঠিল,—তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়াতে যতটা খুসী হয়েছি—আকস্মিকভাবে ভাগ্য পরিবর্ত্তনের এই সংবাদে তার চেয়েও বেশী আনন্দ পাচ্ছি। কিন্তু এতবড় আনন্দের খবরটুকু তোমার এক সময়ের অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও জানাও নি বলে ব্যথাও যে একটু পাই-নি, তা অস্বীকার করতে পারছি না।

হিমাদ্রি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াই উত্তর দিল,—হাঁ, এ কথা তুমি বলতে পার বটে,—কিন্তু ভাই, অকপটেই আমাকে বলতে হচ্ছে,

ভোগের দিক দিয়ে অর্থের যে সার্থকতা, তারই সমাধানে গত দশটা বছর স্বপ্নের মত কেটে গিয়েছে। দুনিয়ার কোনো দিকে আর দৃক্‌পাত করবার ফুর্‌সুদ্‌ পাই নি। মামার বিপুল অর্থ সম্পূর্ণরূপে সার্থক করেছি আকৈশোর উপবাসী মনের পরিচর্য্যায়,—ষোড়শোপচারে দশটি বছরের নিরবচ্ছিন্ন পূজা পেয়ে মন আজ পরিতৃপ্ত।—ঠিক এই সময়টিতেই হঠাৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ।—যাক্‌, এবার তোমার পালা আরম্ভ কর, শুনি। তুমি কলেজে যে রকম মেধাবী ছাত্র ছিলে, তাতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকেও নিশ্চয়ই অনারের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছ এবং আশা করি, কোনো ডিষ্ট্রীক্টের চার্জ্জ পেয়ে—কাযও গুছিয়ে নিয়েছ; নয় কি?

অপরেশ আপন-মনে হাসিয়া বলিল,—কলেজ থেকে ভালভাবেই বেরিয়েছিলাম বলে, সঙ্গে সঙ্গে ভাল কাযও পেয়েছিলাম। কিন্তু ভাই, কায-গুছোনো পরের কথা, কাযটাই রাখতে পারি নি—

অবাক হইয়া হিমাদ্রি বলিয়া উঠিল,—সে কি হে?

অপরেশ একটু হাসিল। তাহার পর গলাটা পরিষ্কার করিয়া উত্তর দিল,—অদৃষ্টের খেলা ভাই। যে অদৃষ্ট তোমাকে দেড়শো টাকার চাকরীর পথ থেকে টেনে এনে জমিদারের গদীর ওপর বসিয়ে দিয়েছে,—সেই অদৃষ্টই আমাকে হাজার টাকা গ্রেডের পাকা চাকরী থেকে খসিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়েছে।

বদ্ধদৃষ্টিতে অপরেশের মুখের দিকে চাহিয়া হিমাদ্রি বলিল,—কলেজ-লাইফে পুরো চারটি বছর তোমার সঙ্গে অন্তরঙ্গের মত মিশে যতখানি তোমাকে জানি, তাতে আমার ধারণা—অন্যায়ের ছায়াও তুমি স্পর্শ করতে পার না। সুতরাং তুমি যে কোনো অন্যায় কায করে দুর্নাম

কিনেছ এবং তার জন্যই চাকরী খুইয়েছ, এ কথা কিছুতেই আমি বিশ্বাস করতে পারি না—

অবিচলিত স্বরে অপরেশ বলিল,—এখনও আমার উপর তোমার এ বিশ্বাস আছে জেনে সত্যই আমি আনন্দ পাচ্ছি। তুমিও শুনে আশ্বস্ত হবে যে, কোনো অন্যায় করে আমি কায হারাই নি—অন্যায়ের আশঙ্কাতেই কায ছাড়তে বাধ্য হই।

জিজ্ঞাসু নয়নে হিমাদ্রি অপরেশের দিকে তাকাইতেই অপরেশ বলিল,—বছর কতক গবরমেণ্টের চাকরী করবার পর, ইউ-পির এক বড় সহরের মিউনিসিপালিটির ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাই। ভেবেছিলাম স্বায়ত্তশাসনের ছায়ায় কায চলবে ভাল, এবং এই সূত্রে দেশবাসীর উপকার করবার সুযোগও পাব প্রচুর। কিন্তু তার ফল হল ঠিক বিপরীত। দেখা গেল, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আশ্রয় করে—প্রতিপত্তিশালী পরিচালকেরাই যা কিছু সুবিধা গ্রহণ করে চলেছেন, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট পাবলিককে বাদ দিয়ে জনকতক সুবিধাবাদীর স্বার্থসিদ্ধির উপায় স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে! ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে এক্ষেত্রে দুইটি মাত্র পথ,—দলে মিশে পড়া, অথবা সরে পড়া। কাযেই বুদ্ধিমানের মত শেষের পথই বেছে নিয়েছি।

বেশ করেছ, সাধুতার পুরস্কার এই ভাবেই পাওয়া যায়!—যাক্, প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে আমাদের এ-ভাবে গল্প করতে দেখে, তোমার লগেজ নিয়ে কুলি-বাবাজী চঞ্চল হয়ে পড়েছে দেখছি! চল, এগিয়ে পড়া যাক্, অবশিষ্ট উপাখ্যান ধীরে-সুস্থে শোনা যাবে। ভাল কথা, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের গম্য-স্থানটি এখন কোথায় শুনি?

মন্দার পাহাড়! ওখানকার ট্রেণ ছাড়তে এখনো ঘণ্টা খানেক দেরী আছে;—চলনা, ততক্ষণ ওয়েটিং-রুমে বসে গল্প করি।

দশ বছরের সঞ্চিত কথাগুলোর শুনানি কি এক ঘণ্টায় শেষ হবে মনে কর? অসম্ভব! বিশেষতঃ স্বয়ং হিমাদ্রি যখন মন্দারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে! আজ তুমি আমার পথে পাওয়া অতিথি;—আপত্তি আছে নাকি?—অভিনেতার ভঙ্গিতে কথাগুলি শেষ করিয়া অপরেশের মুখের উপর চাহিতেই, অপরেশ বলিয়া উঠিল,—আপত্তির কথা এখানে উঠতেই পারে না, যখন দুইপক্ষই সমান উদ্‌গ্রীব।—শুধু একটা সমস্যা এই—সেখানে এই ট্রেনেই আমার উপস্থিতির প্রতীক্ষা তাঁরা করবেন।

তার জন্য কোনো চিন্তা নেই,—একটা 'তার' করে দিলেই এ সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে।

অপরেশ আর কোনো আপত্তি তুলিতে সাহস করিল না। ষ্টেশনের বাহিরে প্রকাণ্ড একখানি মটরকার হিমাদ্রির প্রতীক্ষা করিতেছিল। গাড়ীর অঙ্গসৌষ্ঠব, সোফারের পরিচ্ছদ-পারিপাট্য এবং সমভিব্যাহারী আরদালীর মূল্যবান সাজসজ্জা ও তকমার বৈশিষ্ট্য—তাহাদের অধিকারীর ঐশ্বর্য্য ও সম্ভ্রম-প্রতিপত্তির পরিচয় দিতেছিল।

দুই

আধুনিক কেতায় সুসজ্জিত সুবৃহৎ ড্রয়িংরুমে দুই বন্ধুর বিশ্রম্ভালাপ চলিয়াছিল।

অপরেশ বলিল,—হিমাদ্রি তোমার বাড়ীতো দেখছি একটা প্রকাণ্ড প্যালেস; এর যে-দিকে চাই, সেই দিকেই দেখি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য যেন ছড়ানো রয়েছে! কিন্তু লক্ষ্মীর তো দর্শন পাচ্ছি না!

হিমাদ্রি একটা নিশ্বাস ফেলিল। তাহার পর মৃদু হাসিয়া শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল,—লক্ষ্মী তাঁর ভাণ্ডার খুলে রেখেই সরে পড়েছেন, তাই গোছগাছ করে তোলা আর হয়ে ওঠেনি।—আমার জীবনের এ অধ্যায়টা তোমাকে এখনো শোনাই নি বটে! সংক্ষেপেই বলছি, শোনো,—মনের মত গৃহলক্ষ্মীই পেয়েছিলাম। কিন্তু বছর-তিন ঘর করে, একটি কন্যারত্ন উপহার দিয়েই তিনি বৈকুণ্ঠে চলে গেছেন।

বিমর্ষ হইয়া অপরেশ বলিল,—জীবনের এ অধ্যায়টি তো দেখছি খুবই বিয়োগান্ত! কন্যাটি তাহলে—

—বেঁচে আছে। বোলপুরে শান্তি-নিকেতনে থেকে পড়াশোনা করছে!

—আর তুমি এই বিশাল পুরীতে নিশ্চিন্তমনে একা পড়ে আছ?

—একা থাকলেও, নিশ্চিন্তমনে যে থাকি, সে কথা ঠিক বলা যায় না, কেননা, হাতে আমার এত কাজ থাকে যে, চিন্তার কিছু মাত্র অভাব হয় না।—যাক্, তোমার সব কথা এখনো শোনা হয়নি। কাজ তো ছেড়ে দিলে, তারপর?

অপরেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল,—হাতে কিছু টাকা ছিল, তাই দিয়ে হাজারিবাগ অঞ্চলে একটা মাইকা মাইন কিনে ফেলেছি। এবার এই নিয়েই ভাগ্য-পরীক্ষা আরম্ভ করবার ইচ্ছা আছে।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অপরেশের মুখের দিকে চাহিয়া হিমাদ্রি প্রশ্ন করিল,—মাইনের কায চালাবার মত ক্যাপিটাল হাতে আছে?

মৃদুস্বরে অপরেশ বলিল,—না, আমার হাতে নেই। তবে এখানকারই এক মাড়োয়ারীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হচ্ছে। তিনি পার্টনার হয়ে টাকা যোগাতে রাজী আছেন। মন্দার হিলস্ থেকে ফিরেই কথাটা পাকা করে নেব। তুমি যখন আছ আর ভাবনা কি,—তোমাকেই মধ্যস্থ রেখে লেখাপড়া করা যাবে।

হিমাদ্রি কথাটার মোড় ফিরাইয়া লইয়া বলিল,—কর্ম্মজীবনের কথাতো মোটামুটি শোনা গেল,—কিন্তু আর একটা যে উল্লেখযোগ্য জীবন আছে, তার সম্বন্ধে তো কিছুই উল্লেখ করলে না? এদিকেও কি বন্ধুবর আমারই মত ভাগ্যবান?

অপরেশ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। বন্ধুর মর্ম্মব্যথা উপলব্ধি করিয়া কোমল অন্তরটি তাহার ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল,—ভাগ্যের সব দিক সবাই কি সমান ভাবে পায়? যে লোক অর্থে অধিষ্ঠিত, গৃহে তার শান্তি নেই; পরিপূর্ণ শান্তি যেখানে বিরাজ করে—অভাব সেখানে ছুটে যায়।—এই ভাব সর্ব্বত্র। কর্ম্মজীবনে অশান্তি, অর্থের অসদ্ভাব, এ সব আমার নিত্যসাথী,—তাই ভগবান দয়া করে স্ত্রী-ভাগ্য সম্বন্ধে আমাকে যথেষ্ট দয়া করেছেন।

সোজা হইয়া বসিয়া হিমাদ্রি সোল্লাসে বলিয়া উঠিল,—তোমার এ সৌভাগ্যে আমি আমার হৃদয়ভরা উল্লাস জানাচ্ছি। ছেলেপুলে কয়টি ?

সহাস্যে অপরেশ বলিল, সে সৌভাগ্য এখনো হয় নি,—এবং তার সময়ও এখনো গত হয়নি। আমাদের বিবাহটা একটু বেশী বয়সেই হয়েছে, অবশ্য উভয় তরফ থেকেই ;—দুটি বৎসর এখনো পূর্ণ হয়নি।

—বটে ? তাহলে নিশ্চয়ই খুব শিক্ষিতা ও বয়স্থা কোন সুন্দরীর সাহচর্য্যই পেয়েছ ?

—নিজের মুখে এ-কথার উত্তর দেওয়ার চেয়ে, এদিকে আমি কতবড় ভাগ্যবান, তার যাচাই স্বচক্ষে করাই ভাল নয় কি ?

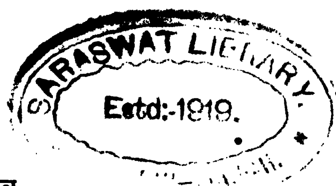
অতিমাত্রায় বিস্মিত ও সেইসঙ্গে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া হিমাদ্রি প্রশ্ন করিল, —এ-কথার মানে ? আচ্ছা,—তাহলে বোধ হয় এ অনুমান আমার মিথ্যা নয় যে, তোমার গৃহলক্ষ্মী মন্দার পাহাড়েই—

হিমাদ্রির কথায় উৎফুল্ল হইয়া অপরেশ বলিল,—হাঁ, উপস্থিত সেই-খানেই তিনি মাতামহের আশ্রয়ে থেকে স্বাস্থ্য-সঞ্চয় করছেন।

—তাহলে তোমাকে এখানে আটকে রেখে ত একটা ভয়ঙ্কর অন্যায় করে ফেলেছি। বিরহিণী বান্ধবী যে মন্দার পাহাড়ে বসে বিরহের দিন গণছেন, তা তো জানা ছিল না, ভাই !

অপরেশ হাসিমুখে বলিল—ভালই হয়েছে, দুই বন্ধু এক সঙ্গে উপস্থিত হয়ে একবারে তাক লাগিয়ে দেওয়া যাবে, প্রায়শ্চিত্ত তাতেই হবে।

পরদিনই, প্রত্যূষের ট্রেণে দুই বন্ধু মন্দার পাহাড়ে যাত্রা করিল।



তিন

ভাগলপুর ষ্টেশন হইতে ট্রেণে উঠিয়া মন্দার পাহাড়ে নামিতে হয়। ট্রেণে ঘণ্টা তিনেকের পথ। গুটি-পাঁচেক ছোট ছোট ষ্টেশনের পর মন্দার হিল-ষ্টেশন। কাছেই ছবির মত একখানি ছোটো পার্ব্বত্য সহর,—প্রকৃতি দেবীর স্বহস্তে রচিত যেন একখানি অভিনব খেলাঘর।

একখানি সুন্দর ছোটোখাটো বাঙ্‌লো। তাহার হাতায় দুই বন্ধু উঠিতেই, পদশব্দ শুনিয়া প্রবীণ গৃহস্বামী ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া আসিলেন। প্রথমেই তাঁহার চক্ষু পড়িল, হিমাদ্রির মুখের উপর। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মহাবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—হুজুর! এভাবে যে এখানে হুজুরের পায়ের ধুলো পড়বে তা তো স্বপ্নেও ভাবিনি—

অপরেশ হাসিয়া বলিল,—এ আমার বন্ধু হিমাদ্রি, দাদামশাই—

হিমাদ্রি স্তম্ভিত ও বিস্ময়বিমুগ্ধ বৃদ্ধের হাতখানি ধরিয়া হাসিয়া বলিল,—আপনি অবাক হয়েছেন আমাকে দেখে—নয় কি ঘোষাল মশাই? কিন্তু সত্যিই, আজ থেকে আপনিও আমার দাদামশাই হলেন।

অপরেশ দুজনের দিকেই চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—ব্যাপার কি?

দাদামহাশয় প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—এই যে বাঙ্‌লো আমি ভাড়া করেছি, এর মালিক ইনিই। শুধু তাই নয়,—মন্দার হিলের বেশীর ভাগটাই এঁর জমিদারী। এত বড় ধনী জমিদার এ তল্লাটে আর নেই। এখানে যে ইনি তোমার বন্ধু হয়ে আসবেন, এ কথা কি একটু আগে কল্পনাও করেছি আমি?

অপরেশ বলিল,—দাদামশায়, ইনি ধনীই হোন, জমিদারই হোন, আর

রাজাই হোন,—আমার যখন বন্ধু,—তখন এঁকে দেখে ঘাবড়াবার কিছু নেই। আপনি যে-ভাবে আমাকে দেখেন, সেই ভাবেই এঁকে দেখবেন। এখন চলুন, আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।

সেই মুহূর্ত্তেই বাড়ীতে রাষ্ট্র হইয়া গেল, অপরেশ যে বন্ধুটিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, সে বড় কেউকেটা নয়,—ভাগলপুরের নামী জমিদার হিমাদ্রি রায়। সুতরাং এহেন সম্মানীয় অতিথির আকস্মিক উপস্থিতি ও সে সম্বন্ধে তাহার পদোচিত অভ্যর্থনার যথাবিহিত ব্যবস্থা লইয়া ভিতরে একটা বৈঠক বসিয়া গেল।

ঘোষাল মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের সহধর্ম্মিণী হেমাঙ্গিনী বলিল,—জামায়ের যেমন কাণ্ড! এত বড় লোকটাকে সঙ্গে করে আনছে, সেটা 'তার' করে জানালেই হত; আমরা তাহলে আগে থাকতে যোগাড়যন্ত্র করে নিতুম।

কথাটা খোঁচার মত সন্ধ্যার মনে বিঁধিয়া গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল,—ওঁকে বন্ধু বলেই সঙ্গে করে এনেছেন,—কিন্তু উনি কত বড়লোক, তার হিসেব করবার প্রয়োজন বোধ হয় মনে করেন নি।

সন্ধ্যার কোনো কথাই কোনো দিনই হেমাঙ্গিনীর বরদাস্ত হইত না, আজও হইল না। সে ঝাঁঝিয়া জবাব দিল,—বন্ধুকে যদি নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে তুলত, তাহলে কথা কইত কে? কিন্তু এ তো তা নয়, মান-অপমান, নিন্দে, অপযশ—ওঁকেই সব মাথা পেতে নিতে হবে না?

সন্ধ্যাও ছাড়িবার মেয়ে নয়। অল্পবয়সী এই দিদিমাটির রূঢ় কথায় কিছুমাত্র রুষ্ট না হইয়া হাসিয়া বলিল,—এতে নিন্দে অপযশের কি আছে দিদিমা? একজন মানুষ এসেছে আমাদের মতই মানুষের ঘরে,—আমরা আমাদের অন্তর দিয়ে যথাসাধ্য তাঁর সেবা করে যাব,—আমাদের যতটুকু

সাধ্য, যতখানি কর্ত্তব্য, তার অবহেলা যদি না করি, তাহলে নিন্দা হবেই বা কেন, আর নিন্দা করবেই বা কে? গরীবের বাড়ী বড় লোক এলে, গরীব যদি তার নিজের অবস্থার মতই সেই বড়লোকের সংকার করে, তাহলে তার নিন্দা কোনো দিক দিয়েই হয় না, বরং নিন্দা হয় সেইখানে —সেই গরীব যদি নিজের অবস্থাকে ছাপিয়ে বড়লোকের খাতির করতে বাজে বাড়াবাড়ী করে।

হেমাঙ্গিনী এ-কথার কোনো যুক্তিযুক্ত উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া আপনমনে গজ্ গজ্ করিতে করিতে উঠিয়া গেল।

সন্ধ্যা গরীবের মেয়ে না হইলেও, বরাবরই তাহার প্রকৃতিতে এই বিশেষত্ব দেখা যাইত যে, সে গরীবায়ানারই সমর্থন করিয়া চলিত। গরীবের প্রসঙ্গ উঠিলেই, সে নিজেকেও তাহাদেরই দলভুক্ত করিয়া লইত। তাহার বাবা অধ্যাপক রামদয়াল ভট্টাচার্য্য মাসিক পাঁচশত টাকা বেতন পাইলেও, নিজেকে পল্লীর গরীব গৃহস্থগণেরই অন্তর্গত মনে করিতেন। শিক্ষিত পিতার এই নিরহঙ্কার ও বিনয়ের আদর্শ কন্যা পূর্ণমাত্রায় আয়ত্ত করিয়াছিল। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জীবনে দুইটি মাত্র লক্ষ্য ছিল। সকল বিষয়েই কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিয়া তোলা, এবং যে পল্লীতে তিনি থাকিতেন, সেখানকার দরিদ্র গৃহস্থগণের অভাব-মোচন করা। এই দুইটি সদনুষ্ঠানে তাঁহার বেতনের অধিকাংশ অর্থ-ই ব্যয়িত হইয়া যাইত।

পিতার উদারতায় ও অর্থব্যয়ে সন্ধ্যা উচ্চশিক্ষার পথে বহুদূর অগ্রসর হইবার যেমন অবকাশ পাইয়াছিল, পক্ষান্তরে উপযুক্ত অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে চরিত্রগঠন, শিল্পচর্চ্চা ও সেবা-শুশ্রূষা সম্বন্ধেও সেইরূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিল। মাতৃহীনা এই বুদ্ধিমতী কন্যাটির

প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাইয়া পিতা তাহাকে মনের মত করিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কন্যার শিক্ষা ব্যপদেশে যেমন তিনি ব্যয়ের দিকে দৃকপাত করিতেন না,—পল্লীর দরিদ্র গৃহস্থ প্রতিবাসীদের আপদবিপদ ও অভাব মোচনেও তেমনই উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন,—রাস্তায় দাঁড়িয়ে যারা ভিক্ষা চায়, তাদের কাছে শতেক দোর খোলা ; কিন্তু এমন অনেক ভদ্র গৃহস্থ আছেন, যাঁরা অনাহারে মৃত্যুকেও বরণ করবেন, তবুও রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত পাততে পারবেন না। এই দলের সংখ্যাই দিন দিন বেড়ে চলেছে, আর—এদের জন্য চিন্তা করাটাই এখন সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।—সন্ধ্যার সহায়তায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় এমন সুশৃঙ্খল ভাবে এদিককার কর্ত্তব্য পালন করিতেন যে, তজ্জন্য জয়ঢাকও বাজিত না,—অথচ যথাযথ স্থানে যথাযথ ভাবে সহায়তার কাজ সম্পন্ন হইয়া যাইত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছিলেন যতটা উদার ভাবাপন্ন ও বদান্য, তাঁহার শ্বশুর—সন্ধ্যার মাতামহ—যজ্ঞেশ্বর ঘোষাল মহাশয় ছিলেন সেই পরিমাণে রক্ষণশীল ও ব্যয়কুণ্ঠ। শ্বশুর-জামাতার প্রকৃতিগত পার্থক্যও ছিল প্রচুর। আটত্রিশ বৎসর বয়সে বিপত্নীক হইয়া জামাতা একমাত্র কন্যা সন্ধ্যার মুখ চাহিয়া পুনরায় পত্নী গ্রহণের কল্পনামাত্র করেন নাই, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর বয়সে শ্বশুর মহাশয় পত্নীশোক বরদাস্ত করিতে না পারিয়া অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণী হেমাঙ্গিনীদেবীকে স্বর্গীয়া পত্নার স্থলাভিষিক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এই বিবাহের বছর কয়েক পরেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় অপরেশের হস্তে সন্ধ্যাকে সম্প্রদান করেন। সস্ত্রীক ঘোষাল মহাশয় এই বিবাহোৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অবকাশ পান নাই।

নবপরিণীতা পত্নী হেমাঙ্গিনীকে লইয়া তিনি জামাতার সংসারেই রহিয়া যান এবং জামাতাও তাঁহাদের এই অবস্থিতিতে অপরিসীম আপ্যায়িত হন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে সকল গুণগ্রামে বিভূষিত ছিলেন, জামাতা অপরেশও সহজাত সংস্কারের মত সেইগুলি প্রাপ্ত হইয়া সন্ধ্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল! এখনও এ-দৃষ্টান্ত বিরল নহে, প্রচুর দক্ষিণাসহ সালঙ্কারা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া কোনও কোনও নির্গুণ গৃহীতা এই ধারণাই মনে মনে পোষণ করে যে, নিতান্ত কৃপাপূর্ব্বক এই গ্রহণ কার্য্যটি সম্পন্ন করিতেছে বলিয়া—কন্যার পিতৃকুলের প্রত্যেকেরই মস্তক এই সঙ্গে তাহার আয়ত্তাধীন হইয়া গিয়াছে,—সুতরাং অতঃপর এই নবলব্ধ ব্যাপারের একাধিপতি সে নিজে এবং ইহারা সকলেই তাহার একান্ত অনুগৃহীত জীব! বলা বাহুল্য, সুশিক্ষিত ও আদর্শ গুণগ্রামে ভূষিত অপরেশ তথাকথিত জামাতা বাবাজীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।—বরং অপরেশ বিবাহের পর শ্বশুরের অবস্থা ও সম্প্রদানকালে তাঁহার অভিভূতভাব উপলব্ধি করিয়া যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল, তাহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সন্ধ্যার হাতখানি অপরেশের হাতে তুলিয়া দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় আবেগভরে বলিয়াছিলেন,—পাঁচ বৎসর বয়সে সন্ধ্যা হয় মাতৃহীন,—সেই থেকে এতদিন—একেই অবলম্বন করে সংসারে আছি। এ অবলম্বন আজ সরে যাচ্ছে—অপরেশ!

অপরেশ অতিকষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিয়াছিল, —বাবা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—এ অবলম্বন আমি সরিয়ে নেব না,—আপনার দীর্ঘ জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত সন্ধ্যা আপনার কাছেই থাকবে।

এ প্রতিশ্রুতি একদিনের জন্যও অপরেশ ভঙ্গ করে নাই। সন্ধ্যাকে তাহার পিতার কাছে রাখিয়া সে একাই কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়াছিল। শ্বশুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সন্ধ্যাকে সঙ্গে লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেও, অপরেশ যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া বলিত,—আপনি কেন কুন্ঠিত হচ্ছেন বাবা, আমার তো কোনো অসুবিধাই দেখছি না। ঘোরাঘুরির কাজ আমার, নানা জায়গায় ছুটোছুটি করতে হয়,—কোনো সদর ডিষ্ট্রিক্টে পাকা হয়ে না বসা পর্য্যন্ত, বাইরে একা একাই থাকা ভাল। যখন বুঝব, সত্যই অসুবিধা হচ্ছে, তখন নিয়ে যাব বই কি।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনে মনে সবই বুঝিতেন। ভাবিতেন,—কন্যা সুপাত্রে পড়লে, ভাগ্যগুণে সেই সুপাত্র সুপুত্রের স্থান অধিকার করে।

হঠাৎ একদিন সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় কালের কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। 'তার' পাইয়া কর্ম্মস্থান হইতে অপরেশ ছুটিয়া আসে। জামাতার মৃত্যুতে মৃতা পত্নীর শোক ঘোষাল মহাশয়কে নূতন করিয়া অভিভূত করে।

শ্রাদ্ধশান্তির পর অপরেশ পত্নী সন্ধ্যার ও সন্ধ্যার পিতা সংসারাশ্রিত দাদা মহাশয় ও দিদিমাকে লইয়া তাহার কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি দেখা দিল। নূতন স্থানটির জল বায়ু সন্ধ্যার শোকমথিত শরীরে সহ্য হইল না। কর্ম্মক্ষেত্রেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এমন অশান্তির সৃষ্টি করিতেছিল যে, বাধ্য হইয়া অপরেশকে কার্য্যে ইস্তফা দিতে হইল। দাদা মহাশয় এই সময় মন্দার হিলে বায়ু পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব তুলিলেন। এ স্থানটি সম্বন্ধে তাঁহার কিছু অভিজ্ঞতাও ছিল। কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে সন্ধ্যাকে রাখিয়া নূতন কর্ম্মের সন্ধান অপরেশের

লক্ষ্য ছিল। দাদা মহাশয় একদিন ভাগলপুরে আসিয়া হিমাদ্রি রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মন্দার হিলের শ্রেষ্ঠ বাঙ্লো খানি ভাড়া করিয়া লয়। অপরেশ দাদা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সন্ধ্যাকে পাঠাইয়া দিয়া অভ্রের খনির সন্ধানে হাজারিবাগে চলিয়া যায়।

সেখানকার কাজকর্ম্মের নিষ্পত্তি করিয়া মন্দার পাহাড়ে ফিরিবার পথে, ভাগলপুর ষ্টেশনে হিমাদ্রির সহিত তাঁহার সহসা সাক্ষাৎ ঘটে।

চার

প্রথম দর্শনেই সন্ধ্যার রূপের অপরিসীম ছটা হিমাদ্রির চোখের উপর ঝলসিত হইয়া তাহাকে চমৎকৃত করিয়া দিল। হিমাদ্রির মনে হইতে লাগিল, জীবনযাত্রার পথে নানা সূত্রে নানাভাবে এ পর্য্যন্ত অনেক রূপসীর রূপের চেহারা তাহার চোখে পড়িয়াছে, দেখিয়া সে অনেকস্থলে তৃপ্তি পাইয়াছে; বহু রূপসীর অপরূপ রূপ সে অবহেলা করিয়াও গিয়াছে। রূপের নেশা এ জীবনে তাহার কাটিয়া গিয়াছে বলিয়াই সম্প্রতি এমন একটা ধারণাও তাহার মনে জাগিয়াছিল; কিন্তু মন্দার পাহাড়ের বাঙ্‌লোর ভিতর সেদিন তরুণী সন্ধ্যার অপূর্ব্ব রূপের প্রখর কিরণ তাহার অন্তরে নূতন করিয়া যে শিহরণ তুলিয়া দিল, তাহাতে এই কথাটাই তাহার মনে বারবার জাগিয়া উঠিতেছিল, ঠিক এমনটি সে বুঝি আর কখনো দেখিবার সুযোগ পায় নাই।

সন্ধ্যাও সে-দিন এই অপরূপ অতিথির সংস্পর্শে আসিয়া তাহার দিকে চাহিতেই ও পরস্পরের চোখাচোখি হইতেই হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া নির্ম্মল দৃষ্টি তাহার ফিরাইয়া লইয়াছিল। তাহারও মনে তখন এই প্রশ্নই জাগিয়াছিল, বহুদিনের পরিচিত বন্ধুর সম্বন্ধে স্বামীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও অন্ধ বিশ্বাস তাহার প্রথম দৃষ্টিতেই কি ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল—কিম্বা সে নিজেই একটা ভুল করিয়া ফেলিল? নিজের চক্ষুকে সহসা নির্ভুল ভাবিতেও তাহার সাহস হইতেছিল না, অথচ পুরুষের দৃষ্টিসম্বন্ধে অভিজ্ঞতালব্ধ চক্ষু তাহার যে খুবই সচকিত ও সপ্রতিভ, সে বিষয়ে তাহার সন্দেহের লেশ মাত্র ছিল না।

চোখোচোখি হইবামাত্র সন্ধ্যার সচকিত চক্ষুর উপর হিমাদ্রি যে নীরব ভাষা পড়িয়াছিল, তাঁহাতেই সে অনুমান করিয়াছিল যে, তাহার দৃষ্টির দুর্ব্বলতা এই অপূর্ব্ব তরুণীর চোখে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই সে অভিনেতার ভঙ্গিতে তাহার লালসাতুর চক্ষুর দৃষ্টিকে এমন ভাবে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল যে, পরবর্ত্তী আলাপ-প্রসঙ্গে উভয়ের দৃষ্টি-বিনিময়ের মধ্যেও পূর্ব্বের সে ভাব আর ধরা পড়িবার অবকাশ পায় নাই। সন্ধ্যাই তখন হিমাদ্রির ব্যবহারে, তাহার কথাবার্ত্তা ও দৃষ্টির ভিতর ভদ্রতার পরিপূর্ণ পরিচয় পাইয়া মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া ভাবিয়াছিল,—নিজের চক্ষুকেও সকল সময় নির্ভুল ভাবা ঠিক নয়।

হিমাদ্রি তাহার মধুর ব্যবহারে একদিনেই এই ক্ষুদ্র পরিবারটির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল। কাহারও মনে সঙ্কোচের বিশেষ কোন ব্যবধান রহিল না। পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ, কথোপকথন, পান-ভোজন—সব বিষয়েই হিমাদ্রি ইহাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান করিয়া লইয়াছিল।

তিন দিন মন্দারে কাটাইয়া, চতুর্থ দিনে হিমাদ্রি এই পরিবারটিকে কয়েকদিনের জন্য ভাগলপুরে তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করিল। অপরেশের আপত্তি করিবার কিছুই ছিল না, দাদামহাশয় হিমাদ্রি রায়ের অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে প্রথম হইতেই তাহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে আপত্তি উঠাই অসম্ভব; হেমাঙ্গিনী দেবী নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়াই পা বাড়াইয়া বসিয়াছিলেন। সন্ধ্যাই শুধু আমন্ত্রণের কথায় অপ্রসন্ন হয়। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার আবর্ত্তে পড়িয়া সম্মতি না দিয়া তাহারও উপায় ছিল না।

ভাগলপুরে আসিয়া বিপুল আদর আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনার মধ্যে হিমাদ্রির অতুল ঐশ্বর্য্যের নিদর্শনগুলির সমস্ত—দুইটি দিনেও অভ্যাগতেরা

সম্যক পরিদর্শন করিয়া উঠিতে পারে নাই। তৃতীয় দিনে জলযোগের পর হিমাদ্রি সহসা বলিল—চলুন, আজ আপনাদের মামার ঠাকুর বাড়ীটা দেখিয়ে আনি।

অপরেশ প্রশ্ন করিল,—এর ভেতর ঠাকুর বাড়ীও আছে তা'হলে?

সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা বলিল,—সেটাই কিন্তু আগে আমাদের দেখানো আপনার উচিত ছিল হিমাদ্রিবাবু!

সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া, মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া হিমাদ্রি একটু ব্যঙ্গের সুরে বলিল,—এখানকার কিছুতেই তো আপনার কিছুমাত্র মনোযোগ দেখা যায়নি,—এই প্রথম একটি জিনিসের জন্য আপনার একটু আগ্রহ দেখলাম। আচ্ছা বলুন তো, সব জিনিস ছেড়ে এইটির ওপরই আপনার এতটা অনুরাগ কেন?

প্রশ্নের প্রত্যেক কথাটির খোঁচা সন্ধ্যাকে বিদ্ধ করিলেও, সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সহজভাবেই উত্তর দিল,—গরীবের ঘরের মেয়েরা রাজ-বাড়ীতে এলেও আগে খোঁজে রান্নাঘর, আর ঠাকুর ঘর। আপনার প্যালেসে রান্নাঘর তো মেয়েদের জুরিস্‌ডিক্‌সনের বাইরে, ঠাকুরবাড়ীও কোন্ মাম্‌দোর অধিকারে রেখেছেন, সেটা দেখবার জন্যই ব্যগ্র হয়েছি—বুঝ'লেন?

দাদামহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। স্বামীর হাস্যোচ্ছ্বসিত মুখের উপর ভ্রূকুটি করিয়া হেমাঙ্গিনী গম্ভীর হইয়া ফিরিয়া বসিলেন,—শিক্ষিতা নাতিনীর বাচালতা তাঁহার বরদাস্ত হইতেছিল না; অপরেশ সকৌতুকে বন্ধুর মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। হিমাদ্রি মুগ্ধভাবে সন্ধ্যার স্বভাবসুন্দর মুখের উপর বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—ঠাকুরবাড়ী হয়ে আছে এখন ঠাকুরদের 'প্রিজন', তার ভিতরেই তাঁরা 'রিগারাস্

ইম্‌প্রিজনমেণ্ট’ ভোগ করছেন ; রিগারাস্ বলছি এই জন্য যে, দানা-পানি দূরের কথা, ফুল-বেলপাতা পর্য্যন্ত বন্ধ ! দেখলেই বুঝবেন, ঠাকুরদের শাস্তিটা কি কঠিন !

সকলেই অবাক হইয়া হিমাদ্রির মুখের দিকে চাহিল। হিমাদ্রি প্রত্যেকের বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে প্রশ্ন পাঠ করিয়াও কোনো উত্তর দিল না,—একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া পূজার-দালানের রুদ্ধ দরজা খুলিয়া দিতে বলিল।

নির্ব্বাক বিস্ময়ে হিমাদ্রির পশ্চাৎ পশ্চাৎ অভ্যাগতেরা ঠাকুর-বাড়ীর অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল। একটা স্বতন্ত্র সুবৃহৎ মহলে এই দেবালয়। সুপ্রশস্ত চত্বর ; চারিধারে বড় বড় ঘর ও দরদালান,—সম্মুখে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সুউচ্চ পূজা মণ্ডপ। তাহার সুবৃহৎ দ্বারগুলি তালাবদ্ধ অবস্থায় দেখা গেল। ভৃত্য দ্বারগুলি খুলিয়া দিতেই সকলে সবিস্ময়ে দেখিল—প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে বিবিধ দুর্লভ সামগ্রী-সম্ভারে সুসজ্জিত বিশাল কক্ষমধ্যে ধাতুনির্ম্মিত অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি। দেবীর মস্তকে রত্নখচিত সুবর্ণমুকুট, সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ রত্নালঙ্কার, পরিধানে উজ্জ্বল পীতবর্ণের বেনারসী শাটি,—তাঁহার পদপ্রান্তে ভীষণ-দর্শন এক অসুরের মূর্ত্তি, তাহার মুখখানা যেমন কদাকার, তেমনই ভয়াবহ,—সেই মুখবিবরনিঃসৃত লেলিহান রসনাটি, দেবী বামহস্তের দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া আছেন,—দক্ষিণ হস্তে উদ্যত লৌহ-মুদ্গর। দেবীর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত, চক্ষু দুইটি এমনভাবে সন্নিবেশিত যে সেদিকে চাহিলেই দৃষ্টি স্বভাবতঃই নত হইয়া পড়ে।

এই অপূর্ব্ব প্রতিমা-দর্শনে অভ্যাগতেরা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে হিমাদ্রি সন্ধ্যার দিকে চাহিতেই দেখিল, ইতোমধ্যেই

সে প্রতিমার পুরোভাগে প্রসারিত আসনথানির উপর নতজানু হইয়া বসিয়া দেবীর দিকে তন্ময়ভাবে চাহিয়া আছে। যে ধাতুময় রক্তবর্ণ প্রকাণ্ড পদ্মটির উপর দেবী উপবিষ্টা, সেই পদ্মের প্রভা যেন সন্ধ্যার মুখখানির উপর পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শোভার বিকাশ করিয়া দিয়াছে; ভাবের আবেশে দুই চক্ষু অশ্রুভারে যেন টল টল করিতেছে।

সন্ধ্যার এই অপরূপ ভঙ্গিটি হিমাদ্রিকে যেন সেই মুহূর্ত্তে স্তব্ধ করিয়া দিল; অতি কষ্টে মনকে সংযত করিয়া, সে অপরেশের দিকে চাহিয়া বলিল,—আশ্চর্য্য তো! ইনি এখনো মূর্ত্তি-টুর্ত্তি মানেন?

অপরেশ হাসিয়া বলিল,—তা তো দেখতেই পাচ্ছ বন্ধু! কিন্তু ইনি খুব ভাল করেই বেদান্তও পড়েছেন।

হিমাদ্রি সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া শ্লেষের সুরে বলিল,—আইডীয়্যাল্ বেদান্তবাদ বটে!

অপরেশ অকুণ্ঠিত ভাবেই উত্তর দিল,—হাঁ, এ সম্বন্ধে এঁর মত খুব উদার। বেদান্তের অখণ্ড ব্রহ্মকে যেমন ইনি স্বীকার করেন,—সেই ব্রহ্মই যে আবার ভক্তের ভক্তির আকর্ষণে বাঞ্ছিত মূর্ত্তি ধরে প্রকট হন—এ বিশ্বাসটুকুও রাখেন।

দাদা মহাশয় বলিলেন,—বাইরে থেকে সন্ধ্যাকে চেনবার যো নেই হিমাদ্রি বাবু! ওর সঙ্গে মিশলে কথাবার্ত্তায় মনে হবে কলেজে-পড়া একটা বাচাল মেয়ে। কিন্তু ওর ভেতরে যে একটা উঁচু দরের আধ্যাত্মিক ভাব ছাইচাপা আগুনের মত লুকিয়ে আছে, তার পরিচয় পেলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

রুদ্ধ কক্ষমধ্যে সন্ধ্যা যে তাহার আরাধ্যা ইষ্টদেবীর প্রতিমা দেখিবে, ইহা সে কল্পনাও করে নাই। আরাধনার সময় ধ্যানে যে মূর্ত্তি সে নিত্য

অন্তরে অন্তরে দর্শন করে, যে মহাদেবী তাহার দেহমন্দিরে চির-অধিষ্ঠিতা, তাঁহারই প্রতিমা এই ধনগর্ব্বিত জমিদারের রুদ্ধ মন্দিরে অনাদরে অপূজিত অবস্থায় বন্দিনীর মত রহিয়াছেন! ইষ্টমূর্ত্তি দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সে যখন নিজেই অপরাধিনীর মত নতজানু হইয়া বসিয়া পড়ে, তখন তাহার মনে হইতেছিল, দেবী যেন দিব্যদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া অনাচারী জমিদারের নিষ্ঠুর আচরণের কথা জানাইতেছেন। কিছুক্ষণ সে যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থাতেই দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। দাদা-মহাশয়ের শেষের কথাগুলি বুঝি তাহার চমক ভাঙিয়া দিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া হিমাদ্রির মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিতেই তাহার সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল! পরক্ষণে দৃষ্টি ফিরাইয়া সে প্রতিমার পদতলবর্ত্তী অসুরের মুখের দিকে তাকাইল। কিছুক্ষণ বদ্ধদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া, আবার সে দৃষ্টি হিমাদ্রির মুখের উপর তুলিয়া ধরিল। চোখো-চোখি হইতেই হিমাদ্রি দেখিল, সন্ধ্যার সেই অপরূপ আরক্তিম মুখখানি অপরাহ্নের শ্বেত পদ্মের মত ম্লান হইয়া গিয়াছে। ঈষৎ চমকিত হইয়া সে বলিল,—ভক্তদের মনে মধ্যে মধ্যে অদ্ভুত ভাবের সঞ্চার হয় শুনেছি,—ধাতুময়ী এই দেবীটি, আমাদের মানবী দেবীর দেহের দরজা ফুটো করে সেই ভাবধারা ঢেলে দিলেন নাকি?

সন্ধ্যা গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল,—আপনি তা ভালভাবেই জানেন। কেননা, দেবীকে যিনি রুদ্ধঘরে কয়েদ করে রাখতে পারেন, দেবীর মনোবৃত্তি তিনিই শুধু বলতে পারেন।

হিমাদ্রি একটু অপ্রস্তুতের মতই বলিল,—দেবীকে এভাবে কয়েদ করে রাখার মূলতত্ত্বটুকু যদি আপনি দয়া করে শোনেন, তাহলে আমার ওপর আপনার হয়তো এ অভিমান থাকবে না। শুনুন তবে বলি,—

ইনি হচ্ছেন আমার মামার কুলদেবী ; তাঁরই কুলপুরোহিত এঁর পুজো করতেন। হঠাৎ তিনি ইহলোকের পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে পরলোকে পাড়ি দিলেন। মামা তো ভেবেই অস্থির, পূজো কে করবে? শেষে সন্ধান পেয়ে, পাহাড় থেকে এক সন্ন্যাসীকে পাকড়াও করে আন্‌লেন,—সে নাকি সিদ্ধ পুরুষ, অদ্ভুত ক্ষমতা তার! তিনিও এসে প্রথম পূজোয় বসেছেন, আমিও ঠিক সেই সময় ম্যাট্রিক পাশ করেছি—তারই সুখবর নিয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে মামার পায়ে মাথা ঠেকালাম। মামা খুসী হয়ে বললেন—ঠাকুরবাড়ীতে আগে যা, মা'কে গড় করে, সন্ন্যাসী ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ নিয়ে আয়। ছুটলাম ঠাকুর ঘরে, মা'কে গড় করে যেমন মাথা তুলেছি, অমনি সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে হলো চোখোচোখি ; তিনি আমাকে দেখেই এমন আঁতকে উঠলেন যে, সামনে সাপ দেখলেও সে বুঝি অতটা শিউরে ওঠে না,—তার পরই রাঙ্গা রাঙ্গা চোখ দুটো পাকিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন,—দূর্—দূর্—বেরো এখান থেকে। আমি একেবারে হতভম্ব! তাতেও তাঁর কি রাগ,—ঐ ঘণ্টাটা তুললেন আমাকে মারবার জন্য। আমি লাফিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। তর্জ্জন শুনে মামাও ছুটে এসেছিলেন। সব শুনে ঠাকুর-ঘরে তিনি ঢুকতেই সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলে—ও কে? মামা আমার পরিচয় দিতে সে মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল—ও অসুর, চিরশত্রু ;—ওকে এ ঘরে ঢুকতে দিস্ নি, তোর ত্রিসীমায় রাখিস্ নি,—অসুরের ঐ মুখখানা আমি ওর কাঁধের উপর স্পষ্ট দেখেছি।

বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনলাম। সেই দিনই আমাকে মামা কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। এ বাড়ীতে মাথা গলাবার অধিকারটুকু সেই থেকেই আমাকে হারাতে হয়। তার পর টেলিগ্রাম পেয়ে আমি যখন আসি,

মামা তখন খাবি খাচ্ছিলেন, কিছু বলতে কইতে পারেন নি, সন্ন্যাসীটি তখন পর্য্যন্ত ছিলেন—মামার প্রাণরক্ষার জন্যে নানা 'বুজরুকিই করছিলেন। আমার অদৃষ্টে তখন এই দৌলত নাচছে, রোখে কে? মামা তো গেলেন; তাঁর কাজ শেষ করে বাড়ীতে ফিরেই একটা হাণ্টার নিয়ে এখানে ছুটে এলাম। সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে একবার বোঝা-পড়া করবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এসে দেখলাম, ঠাকুর অসুর সাজ-সরঞ্জাম সবই ঠিক আছে, নেই সুধু সেই সন্ন্যাসী!—তখন সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল এই প্রতিমার ওপর। দেওয়ান এসে জানতে চাইলে, পূজার কি ব্যবস্থা হবে? কিছুমাত্র না ভেবে চিন্তেই হুকুম দিলাম—সেই সন্ন্যাসী না ফেরা পর্য্যন্ত ঠাকুর এই ঘরেই কয়েদ থাকবে।—দশ বছর পরে আজ এই প্রথম ঘরের দরজা খোলা হয়েছে, আর সেই সন্ন্যাসীর পর সন্ধ্যাদেবী পূজার আসনে এই প্রথম বসেছেন।

কথাগুলি শেষ করিয়া সন্ধ্যার দিকে চাহিতেই হিমাদ্রি দেখিল, সেইমাত্র সন্ধ্যা তাহার চক্ষু দুইটি হিমাদ্রির মুখের উপর হইতে ফিরাইয়া সেই ভয়াবহ অসুরের মুখের উপর ফেলিয়াছে।

হিমাদ্রি ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—আপনিও বুঝি তুলনায় সমালোচনা করতে ব্যস্ত হয়েছেন? হিমাদ্রি রায়ের কাঁধের ওপর ঐ অসুরটার মুখ সেই সন্ন্যাসীর মত আপনার চোখেও পড়েছে নাকি?

সন্ধ্যা হাসিল। সে হাসি অপূর্ব্ব। ভাষা যেন তাহার ভিতর জ্বল্ জ্বল্ করিয়া ভাসিতেছে। হিমাদ্রি এ হাসির অর্থ নির্ণয় করিতে পারিতেছিল না। তাহাকে বিব্রত বুঝিয়া সন্ধ্যা একটু মিনতির সুরে বলিল,—একটা অনুরোধ আপনাকে জানাতে চাই, যদি রাখেন তো বলি।

হিমাদ্রি সন্ধ্যার মুখের উপর দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিল,—দেখুন, সন্ন্যাসীর

ঠেলায় মামার সঙ্গ ছাড়া হয়ে, কলকাতায় গিয়ে অপরেশকে পাই। ক'টা বছর দুজনে একসঙ্গে কাটিয়েছি। একটি দিনের জন্ম আমাদের মধ্যে ঠোকাঠুকি হয় নি। দুজনেই মনে প্রাণে এক হয়ে গিয়েছিলাম। সেই অপরেশের অর্দ্ধাঙ্গিনী আপনি, আজ আমার মাননীয়া অতিথি। আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে বোধ হয় কোন দিক দিয়েই আমাকে বিব্রত হতে হবে না, হলেও আমি তাতে প্রস্তুত।

সন্ধ্যা আর ভূমিকা না করিয়াই সোজাসুজি বলিল,—দশ বছর পরে যখন আপনাদের রুদ্ধ মন্দিরের দরজা খোলা হয়েছে, তখন আর বন্ধ করবেন না; আপনার ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা আমি তুলছি না, কর্ত্তব্যের দিক দিয়েও, এই প্রতিমার নিত্যপূজার একটা ব্যবস্থা করা যে আপনার উচিত, এই কথাই আমি বলছি,—শুধু যে সাধারণভাবে বলছি, তা নয়,—একান্ত অনুরোধ করছি।

হিমাদ্রির মুখখানা সহসা কেমন যেন হইয়া গেল। সে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর সন্ধ্যার দিকে বিস্মিতভাবে তাকাইয়া ব্যথার সুরে বলিল,—আপনার কোমল মনটি যে বেদনায় ভরে উঠেছে তা বেশ বুঝতে পারছি; আর এও জানছি যে, ব্যথাটা আমার মর্ম্মবাণী শুনে নয়,—প্রতিমার পূজা বন্ধ হওয়ার ব্যথাটাই আপনাকে শুধু পীড়া দিচ্ছে। সে যা হোক, আপনার অনুরোধ বহুমানে মাথায় আমি তুলে নিতে প্রস্তুত, যদি আপনি নিজে এর ভার নিতে পারেন।

সন্ধ্যা চমকিয়া উঠিল, দৃষ্টি তাহার অপরেশের মুখের উপর তুলিয়া ধরিতেই দেখিল, তাহার মুখেও কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিমাদ্রি তখনও সন্ধ্যার মুখের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। সন্ধ্যা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল,—যে ক'দিন আপনার অতিথি হয়ে

আমরা এখানে আছি, এ ঘরের সমস্ত ভার-ই না-হয় নিলুম কিন্তু তারপর তো আপনাকে উপযুক্ত লোক রাখতে হবে ?

অসহিষ্ণু ভাবে হিমাদ্রি বলিয়া উঠিল,—না, লোকের ওপর আমার বিশ্বাস নেই।

সন্ধ্যার মুখের উপর দৃঢ়তার একটা আভা ফুটিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সহজ-কোমল কণ্ঠস্বরকে একটু তীক্ষ্ণ করিয়াই সে বলিয়া ফেলিল,—লোকের ওপর ভার দিয়েই তো এত বড় জমিদারী চালাচ্ছেন, ছোট এই ঠাকুর-ঘরটির ভার দিতেই বা লোককে এত অবিশ্বাস কেন ?

সন্ধ্যার কথাটা হিমাদ্রিকে যেন একটু অপ্রস্তুত করিয়া তুলিল। কিন্তু সে ভাবটা তখনই সামলাইয়া লইয়া সে-ও পাণ্টা জবাব দিল,—আপনি ঠিক ধরেছেন, যত অবিশ্বাস এইখানেই। কেন তা শুনবেন ? সন্ন্যাসীর কথাটা সবাই শুনে ফেলেছে। যে এই আসনে এসে বসবে, সেই দেখবে—আমার কাঁধের ওপর ঐ অসুরের মুখ।

হিমাদ্রির এই অনুমানটা আর সকলকে হাসাইয়া দিলেও, সন্ধ্যার মুখের ভাব পূর্ব্ববৎ অপরিবর্ত্তিতই রহিয়া গেল। কিছুমাত্র উচ্ছ্বসিত না হইয়াই সে প্রশ্ন করিল,—আমার ওপর ভার পড়লে, আমিও যে ঐ বস্তুটি দেখব না, তা আপনি কি করে বিশ্বাস করছেন ?

দৃঢ়স্বরে হিমাদ্রি উত্তর দিল,—এ বিশ্বাস আমার আছে। তাহার পর স্বর যতদূর সম্ভব কোমল করিয়া বলিল,—আপনি কখনও অতটা নিষ্ঠুর হবেন না।

সন্ধ্যা কথাগুলি চুপ করিয়া শুনিল, তাহার ব্যথিত চিত্তটি মুহূর্ত্তের জন্য দুলিয়া উঠিল, তাহার পর আত্মসম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে সে বলিল,—

নিষ্ঠুর কেউ সহজে হয় না হিমাদ্রি বাবু! মানুষের যে ব্যবহার মানুষকে করে দয়ালু, সেইটেই বিরূপ হয়ে তাকে ক'রে তোলে নিষ্ঠুর! সে যাই হোক, যে ক'দিন আমরা এখানে আছি, এদিককার ব্যবস্থা আমরাই করে নেব, তার পরের কথা—পরে হবে।

কিছুক্ষণ পরেই দেবী পূজার ব্যবস্থার জন্য হিমাদ্রির আদেশে লোকজন সকলেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিল।

পাঁচ

প্রথম দর্শনেই সন্ধ্যার রূপের মোহ হিমাদ্রিকে অভিভূত করিয়াছিল এবং কয়দিনের ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা ও কথাবার্ত্তায় সে মোহ ক্রমশঃই অচ্ছেদ্য হইয়া উঠিয়াছিল। হিমাদ্রি বুঝিয়াছিল যে, সন্ধ্যাকে ছাড়িয়া তাহার থাকিবার উপায় নাই, সন্ধ্যার সাহচর্য্য তাহার চাই-ই। এই সাহচর্য্যটুকু পরিপূর্ণভাবে পাইবার জন্য সে জমিদারসুলভ বিষয়-বুদ্ধির বিকাশ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই।

অপরেশের সহিত কথাবার্ত্তায় হিমাদ্রি জানিয়া লইয়াছিল যে, তাহাদের আর্থিক অবস্থা বর্ত্তমানে মোটের উপর খুবই খারাপ। সন্ধ্যার পিতা মোটা মাহিনার চাকরী করিয়াও কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই ; এমন কি সারাজীবন পরের বাড়ী ভাড়া লইয়াই কাটাইয়া গিয়াছেন। দাদামহাশয়ের অবস্থাও তথৈবচ, পেন্‌সনের গোটা পঁচিশ টাকা মাত্র তাঁহার আয়, তাহার অর্দ্ধাংশ দিদিমার গহনার দেনায় যায়। অপরেশের উপরই সাংসারিক সমস্ত ব্যয় নির্ভর করে। চাকরী করিয়া সে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল, খনি কিনিতেই তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে, বরং কিছু ঋণও হইয়াছে। মন্দার হিলের বাঙলোর ভাড়াও দুই মাস পড়িয়া গিয়াছে। এই তো উহাদের আর্থিক অবস্থা। এক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহায়তায় এই বিপন্ন পরিবারটিকে বশীভূত করা এমন কি কঠিন কাজ? অতএব অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী বন্ধুবৎসল জমিদারের চক্রান্তজাল আস্তে আস্তে বন্ধুর উপর সর্ব্বতোভাবে প্রসারিত হইতে লাগিল।

খনির কাজে মূলধন দিয়া যে মাড়োয়ারী অপরেশের অংশীদার হইতে

রাজী ছিল,—সে হঠাৎ অপরেশকে বলিয়া দিল যে, উপস্থিত টাকা লাগাইবার সুবিধা তাহার হইবেনা, অপরেশবাবু যেন অন্যত্র চেষ্টা করেন।

যে সময় লেখাপড়া পাকা হইবার কথা, ঠিক সেই সময়টিতে এই নির্ঘাত সংবাদ পাইয়া অপরেশ একেবারে যেন আকাশ হইতে নামিয়া পড়িল! কি সর্ব্বনাশ—এখন উপায় ?

বৈকালে চায়ের মজলিসে বসিয়া সকলে অপরেশের প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় বিষণ্ণমুখে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া অপরেশ সংবাদটা শুনাইয়া দিল।

কথাটা শুনিয়াই হিমাদ্রি সন্ধ্যার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, এই সংবাদে তাহার প্রফুল্ল মুখখানা যেন মুস্‌ড়াইয়া গিয়াছে।

দাদামহাশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—বল কি হে, কথাবার্ত্তা সব ঠিক, শেষ সময়—গাছে চড়িয়ে মই নিলে কেড়ে! অত বড় ধনী মাড়োয়ারী, এই তার কথার দাম ?

হিমাদ্রি গম্ভীর হইয়া বলিল,—এদের স্বভাবই এই রকম। শাঁখের করাতের মত যেখানে আসতে যেতে কাট্‌বার সুবিধে, এরা সেখানেই টাকা ঢালে। পাশ করা বাঙ্গালীদের সঙ্গে ভিড়তে এরা ভয় পায়।—তাহলে এখন কি করবে অপরেশ ?

অপরেশ হতাশের সুরে বলিল,—কিছুইতো স্থির করতে পারছি না; অথচ এক সপ্তাহের মধ্যে কাজ আরম্ভ করতে না পারলে এ জিনিসটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

এ কাজে কত টাকার দরকার বল তো ?

আপাততঃ দশ হাজার টাকা হাতে করে কাজ আরম্ভ করা চাই,

পরে দরকার হলে, আরো পনের হাজার টাকা লাগাতে হবে।—এই কথাই হয়েছিল।

মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া, হিমাদ্রি সহসা দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, —কুছ্ পরোয়া নেই—কালই তুমি পঁচিশ হাজার টাকা পাবে।

কথাটা সকলকেই চমকিত করিয়া দিল। অপরেশ স্তব্ধ বিস্ময়ে হিমাদ্রির মুখের দিকে চাহিতেই সে গাঢ়স্বরে বলিল,—এতে অবাক হবার কি আছে অপরেশ? যে লোক তোমাকে টাকা দেবে বলেছিল, সে আমার প্রজা ও খাতক; সে দেয় নি বলে, আমি যদি দিতে চাই, তাতে বিস্ময়ের কিছু আছে কি?

আমি না চাইতেই, এত টাকা তুমি দিতে চাইছ, কিন্তু—

এতে কিন্তু কিছু নেই। হাঁ, তবে প্রশ্ন করতে পার বটে, কোন্ স্বার্থে বা কি সর্ত্তে এই টাকা আমি দিচ্ছি? আমার স্বার্থ—তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, আর সর্ত্ত এই যে,—যদি লাভ হয়, বংশী মাড়োয়ারীকে যে অংশ দেবে বলেছিলে, আমাকে না হয় তাই দিয়ো—

তাহলে এর একটা লেখা-পড়া—

কথাটা শুনিয়াই হিমাদ্রির মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। সেই হাস্যোচ্ছ্বসিত মুখে ব্যঙ্গের সুর তুলিয়া সে বলিল—এই ক'টা টাকার জন্যে হিমাদ্রি রায় বন্ধুর সঙ্গে লেখা-পড়া করেনা, বিশেষতঃ বন্ধুপত্নীর সামনেই যখন কথাটা পাকা হয়ে যাচ্ছে!

কথাটা শেষ করিয়াই হিমাদ্রি সন্ধ্যার মুখের উপর তাহার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই সবিস্ময়ে দেখিল, সন্ধ্যার সেই অনিন্দসুন্দর মুখখানির উপর কে যেন এক ঝলক কালি ঢালিয়া দিয়াছে, যেন একটি পাথরের প্রতিমা স্থির হইয়া বসিয়া আছে—মুখের একটি পেশীও নড়িতেছে না!

পরদিনই অপরেশকে সমস্ত টাকা বুঝাইয়া দিয়া হিমাদ্রি জিজ্ঞাসা করিল,—এঁরাও কি তাহলে তোমার সঙ্গেই যাচ্ছেন ?

অপরেশ বলিল,—সঙ্গে যাবার ইচ্ছাটা সন্ধ্যারই বেশী ; কিন্তু সেটা একেবারে অসম্ভব। কেননা, যেখানে আমার খনি, ফ্যামিলি নিয়ে থাকবার কোনো ব্যবস্থাই সেখানে নেই। ব্যবস্থা করে নিতে পাঁচ ছ মাস সময় লাগবে। সেই সময় এসে এঁদের নিয়ে যাব।

এইদিনই অপরাহ্নে হিমাদ্রি দাদামহাশয়ের দিকে চাহিয়া সহসা বলিল,—আপনার ওপর আমাকে একটা অত্যাচার করতে হচ্ছে দাদামশাই—নিতান্ত বাধ্য হয়েই ; মাফ্ করতে আজ্ঞা হোক—

দাদামহাশয় অবাক হইয়া হিমাদ্রির দিকে চাহিয়া রহিলেন, সহসা কথা বাহির হইল না। হিমাদ্রিই হাসিয়া অত্যাচারের কথাটা বর্ণনা করিল। বলিল,—একটু আগে আমার পাহাড়ের ইঞ্জিনিয়ার এসে খবর দিয়ে গেল, যে পাহাড়ের ওপর আপনাদের বাঙলো, তার ভিতের পাথর ধ্বসে পড়বার উপক্রম হয়েছে—

সভয়-বিস্ময়ে দাদামহাশয় বলিয়া উঠিলেন,—কি সর্ব্বনাশ !

দিদিমা আর্ত্তস্বরে বলিলেন,—আমাদের যথা-সর্ব্বস্ব যে সেখানে রয়েছে গো,—এখন উপায় ?

সন্ধ্যা নির্ব্বাক-বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল।

হিমাদ্রি বলিল,—ভাবনার কোনো কারণ নেই—দাদামশাই, সঙ্গে-সঙ্গেই কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। ভাবনা শুধু এই জন্যে যে—মেরামত করতে মাস খানেক সময় লাগবে, এই একটা মাস আপনাদের একটু কষ্ট করতে হবে। খবর নিয়ে জানলাম, সেখানে কোনো বাঙলোই এখন খালি নেই—

সন্ধ্যা স্থিরদৃষ্টিতে হিমাদ্রির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—আপনার লোক বোধ হয় আপনার বাঙলোগুলোরই খবর দিয়েছে, কিন্তু একটু তফাতে পাহাড়ের নীচে দু'তিন খানা বাড়ী আছে, সেগুলো প্রায়ই খালি পড়ে থাকে,—তারই একখানা ভাড়া নিয়ে আপাততঃ আমরা থাকতে পারি।

হিমাদ্রি একটু যেন দমিয়া গেল; কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই উৎসাহিত হইয়া উপেক্ষার সুরে বলিল,—সিংহীদের সেই পোড়ো বাঙলোর কথা বলছেন বুঝি? থাইসিসের জারমস্ সেখানে গিস্ গিস্ করছে তা তো জানেন না! সেখানে বাস করতে পারবেন?

থাইসিসের নামে দাদামহাশয় সর্ব্বাগ্রে শিহরিয়া উঠিলেন। মৃত্যুর দ্বারের সান্নিধ্যে যাহারা আসিয়া দাঁড়ায়, মৃত্যুভয় তাহাদিগকেই বেশী আর্ত্ত করিয়া তুলে।

হিমাদ্রি সময় বুঝিয়া সহসা বলিল,—আচ্ছা অপরেশ, বাঙলোখানা মেরামত না হওয়া পর্য্যন্ত এঁরা যদি এখানে থেকে যান, তাতে বিশেষ কিছু অসুবিধা হবে কি?

একেতো হিমাদ্রির উপর অপরেশের অসীম বিশ্বাস, তাহার উপর এত বড় উপকার সে তাহার করিয়াছে। কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় তখন পরিপূর্ণ হইয়া আছে; কোনোদিকে না চাহিয়া, কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই সে উৎফুল্লভাবে বলিয়া উঠিল,—বেশ ভাই, তাই হবে। বাঙলোখানা মেরামত না হওয়া পর্য্যন্ত এঁরা এখানেই থাক্‌বেন। তুমি কালই জিনিসপত্রগুলো তোমার লোক দিয়ে আনাবার ব্যবস্থা কর। তার ভেতর আমারও একটা লগেজ আছে।

হাসিয়া হিমাদ্রি বলিল,—সত্যই এতে আমি অনুগৃহীত হ'লাম বন্ধু!

কিন্তু দুই বন্ধুর দৃষ্টি যদি সেই মুহূর্ত্তে সন্ধ্যার মুখের উপর পড়িত, তাহা হইলে সবিস্ময়ে তাহারা দেখিতে পাইত, অগাধ জলে উষার বিকশিত পদ্মের মত সন্ধ্যার স্নিগ্ধ মুখখানি—সন্ধ্যার স্থলপদ্মের মতই মুসড়াইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে।

ছয়

সন্ধ্যা তাহার ভাবপ্রবণ স্বামীটিকে ভালরূপেই চিনিয়াছিল। ভাবের আতিশয্যে সে যাহার উপরেই সহসা আকৃষ্ট হইয়া পড়িত, অসঙ্কোচে তাহার নিকট হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিত; কোনো সঙ্কোচ, কোন সংশয়, কোনো দ্বিধা তাহার মনে সে সময় স্থান পাইত না, বা কেহই তাহাকে কোনো প্রকারেই তাহার অন্ধ-বিশ্বাস শিথিল করিতে সমর্থ হইত না। হিমাদ্রির সম্বন্ধে সন্ধ্যার মনে ইদানীং যে সংশয় বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছিল, স্বামীর বিরাগভাজনের আশঙ্কায় তাহা সে যেমন প্রকাশ করে নাই, হিমাদ্রির সহায়তায় স্বামীর এই নূতন কর্ম্মোদ্যম একটা অভিশাপের মত—ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াও সে কোনো প্রকার বাধা দেয় নাই। আত্মশক্তির উপর তাহার এমন অপরিসীম বিশ্বাস ছিল যে, এই সূত্রে একটা আসন্ন দুর্য্যোগ অনুমান করিয়াও অবিচলিতচিত্তে সে স্বামীর সিদ্ধান্তই মানিয়া লইয়াছে; অর্থাৎ,—একদিন হিমাদ্র সন্ধ্যার অনুরোধের উত্তরে সসম্ভ্রমে তাহাকে যে ভার লইতে অনুরোধ করিয়াছিল, পাকেচক্রে সেই ভার তাহাকে স্থায়ীভাবেই গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং অপরেশ হিমাদ্রির তত্ত্বাবধানে ইহাদের রাখিয়া হাজারিবাগের অভ্রের খনিতে কাজ করিতে চলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু যে আশায় হিমাদ্রি ঘটা করিয়া এত আয়োজন করিয়াছিল, যতদিন যাইতে লাগিল, সেই আশাই তাহাকে ততটা উদ্‌ভ্রান্ত ও মোহ-বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল। অপরেশ উপস্থিত থাকিতে অধিকাংশ সময়ই সন্ধ্যার যে সাহচর্য্য পাওয়াটা তাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হয়

নাই, অপরেশের অনুপস্থিতিতে সেটা ক্রমশঃই হ্রস্ব হইয়া আসে এবং ঠাকুরঘরের দেবীপ্রতিমার সংশ্রবেই সেটা দিন দিন প্রগাঢ় ও দীর্ঘতর হইতে থাকে। কথাবার্ত্তা যে তাহাদের মধ্যে হইত না, কিম্বা সন্ধ্যা যে হিমাদ্রির সংস্পর্শেই আসিত না, তাহা নহে ; বরং হিমাদ্রির সহিত সন্ধ্যার কথোপকথন, মেলা-মেশাও সাধারণ ব্যবহারে এমন একটা সঙ্কোচশূন্য মার্জ্জিত ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিত, যাহা কোনো একান্নবর্ত্তীবৃহৎ পরিবারে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্টা তরুণী গৃহিনীর মাতৃত্বের মহিমাদ্যোতক ভাবধারার মত সম্ভ্রমসূচক !

হিমাদ্রির মনোবৃত্তি সম্বন্ধে সন্ধ্যা যতটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল, তাহাতে সম্ভবতঃ সে এই ধারণাই স্থির করিয়া লয় যে, সদা সর্ব্বদা হিমাদ্রির সংশ্রব এড়াইয়া যাইলে বা লুকাইয়া পলাইয়া বেড়াইলে, তাহার অন্তরের প্রচ্ছন্ন লালসাকে ক্রমশঃ উদ্দাম গতিতে মূর্ত্ত হইবার অবকাশ দেওয়া হইবে। সেই জন্যই হিমাদ্রির সংস্পর্শে যখনই সে আসিত, এমনই একটা সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব তাহার আচরণে প্রকাশ পাইত ও সেই ভাবটি এমন একটা গাম্ভীর্য্যের ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিত যে, অনেক সময় মনের অনেক গূঢ় কথা বলি-বলি করিয়াও হিমাদ্রি বলিতে পারিত না।

কিন্তু ক্রমশঃই হিমাদ্রির এ সঙ্কোচের পরদা আস্তে-আস্তে সরিতেছিল ও তাহার ভিতর দিয়া সাহস উঁকি দিতেছিল। মধ্যে মধ্যে, সময় বুঝিয়া, সন্ধ্যাকে একান্তে পাইলে সহসা সে এক-আধটা বেফাঁস কথা কহিতেও দ্বিধা করিত না,—কিন্তু সন্ধ্যার বাক্‌পটুতায় তাহাও অনেক সময় ব্যর্থ হইয়া যাইত, অথবা অনভ্যস্ত হাতে নিক্ষিপ্ত ঢিলের মত তাহা ফিরিয়া আসিয়া তাহাকেই আঘাত করিত।

সন্ধ্যাও যথন বুঝিল, হিমাদ্রির সাহস ক্রমশঃই বাড়িতেছে, তখন সেও সেই অনুপাতে ঠাকুর ঘরের কাজেই তার সময়ের অধিকাংশ কাটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিল! সকলের সমক্ষে একদিন হিমাদ্রি এ সম্বন্ধে সন্ধ্যাকে প্রশ্ন করিলে সে সহজ ভাবেই বলিয়াছিল যে, একটা ব্রতের জন্য মাসখানেক তাকে বেশীর ভাগ ঠাকুরঘরেই কাটাইতে হইবে।

কিন্তু তিন মাস কাটিয়া গেলেও ঠাকুরঘরে সন্ধ্যার স্থিতির কাল যখন খর্ব্ব হইবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, তখন একদিন হিমাদ্রিকে সহসা ঠাকুরঘরের দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল। পূজান্তে সন্ধ্যা সবেমাত্র দেবী-স্তোত্র সমাপ্ত করিয়াছে,—স্তোত্রের শেষ দুটি পদ তখনো যেন মন্দির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—

"পীতাম্বরাং দ্বিভুজাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্রকোজ্জ্বলাম্
শীলা-মুদ্গর-হস্তাঞ্চ স্মরেত্তাং বগলামুখীম্।"

প্রতিমার সম্মুখে আসনোপবিষ্টা ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রা সন্ধ্যার রূপের আর একটা দিক হিমাদ্রির মোহবিহ্বল চক্ষুর উপর উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। সে মুগ্ধের মত বলিয়া উঠিল,—বাঃ! কি সুন্দর!

স্বর শুনিয়া সন্ধ্যা শিহরিয়া উঠিল না, চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলও না; কোশা হইতে এক কুশি গঙ্গাজল লইয়া রক্তচন্দনলিপ্ত আঙ্গুলগুলি ধুইতে ধুইতে আস্তে আস্তে বলিল,—হঠাৎ এখানে আগমন যে!

হিমাদ্রি জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—কি করি বলুন, আপনার দর্শন পাওয়াটা ক্রমশঃই যে দুর্লভ হয়ে দাঁড়াচ্ছে—

অবিচলিত স্বরে সেই ভাবেই সন্ধ্যা বলিল,—এখানে কিছুদিন থাকবার ছুটি তো আপনাদের কাছ থেকেই চেয়ে নিয়েছি, হিমাদ্রি বাবু!

একটু উত্তেজিত স্বরেই হিমাদ্রি বলিল,—আপনার পূজোপর্ব্ব এক মাসেই শেষ হবে বলেছিলেন, কিন্তু তিন মাস হয়ে গেল, তবুও এর নিষ্পত্তি নেই!

সন্ধ্যা একথার উত্তরে ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল,—এখানকার এক-একটা মাস এমনি দীর্ঘতরই বটে!

হিমাদ্রি একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আপনার একথাটার মানে?

হাতের কাজগুলি গুছাইতে গুছাইতে সন্ধ্যা বলিল—মানে কি, আপনি বুঝতে পারেন নি? আপনার দিক দিয়েই একটু ভেবে দেখুন না!

হিমাদ্রির মুখখানা লাল হইয়া গেল। কথাটার মানে সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। মন্দার হিলের বাঙ্‌লোখানা এক মাসের মধ্যে সংস্কার করাইয়া সন্ধ্যাদের সেখানে পাঠাইয়া দিবে এমন একটা কথা সে জোর করিয়াই একদিন বলিয়াছিল। তাহার পর তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে বাঙলো আজ পর্য্যন্ত নাকি মানুষের বাসোপযুক্ত হইয়া উঠে নাই। সন্ধ্যার কথার এই খোঁচাটা সহ্য করিয়াই সে বলিল,—মানে বুঝতে পেরেছি। আর, বুঝেও নির্লজ্জের মত আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, মন্দার হিলের বাঙ্‌লোর পাল্টা জবাবেই কি আপনার এই ঠাকুর ঘরে এভাবে দেহত্যাগ?

সন্ধ্যার মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। দৃষ্টি সংযত করিয়া হিমাদ্রির দিকে চাহিয়া সে বলিল,—ত্যাগের সঙ্গে আপনার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় কিনা, সেইজন্যেই ঠাকুর ঘরে কয়েক ঘণ্টা কাটানোকে দেহত্যাগের পর্য্যায়ে ফেলেছেন!—পরক্ষণে কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া সে বলিল,—দেখুন, আপনার

বাড়ীতে আশ্রয় নেবার মস্ত প্রলোভন ছিল আমার পক্ষে—এই প্রতিমা! কিন্তু আমি জানতুম না যে, বেশীক্ষণ এঁর অর্চ্চনাও একটা অন্যায় বা অপরাধ, আপনাদের কাছে!

সন্ধ্যার ব্যথাহত-স্বরে হিমাদ্রি যেন অভিভূত হইয়া গেল। সেও সান্ত্বনার ছলে করুণ সুরে বলিল—আপনি যদি মনে করে থাকেন যে, আমরা আপনার স্বাধীনতায় হাত দিয়েছি, তাহলে আপনি মস্ত ভুল করেছেন। অপরেশ নেই এখানে, আপনি একলা একলা আমাদের এড়িয়ে এখানে থাকেন, এতে আমরা ব্যথা পাই। আপনি না থাকলে আমাদের কিছুতেই উৎসাহ আসে না। চায়ের মজলিসই বলুন, আর তাসের আড্ডাই বলুন। আপনি ক্রমে ক্রমে সবই ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনী হচ্ছেন দেখে আমরা ব্যথা পাচ্ছি মাত্র।

সন্ধ্যা একবার স্থির দৃষ্টিতে হিমাদ্রির মুখের দিকে চাহিবামাত্রই দেখিল, হিমাদ্রির দুই চক্ষু তাহারই মুখের উপরে পড়িয়া আছে এবং যাহার ভাষায় এত করুণার আভাষ, তাহার দৃষ্টিতে কি লালসার ধারা! শিহরিয়া উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু নত করিয়া সে বলিল,—বেশ, কাল থেকে এখানকার সময় একটু খাটো করবারই চেষ্টা করবো।

ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যার অনাড়ম্বর সুষ্ঠু সজ্জা ও তাহার ভিতর দিয়া রূপের একটা স্নিগ্ধ প্রভা হিমাদ্রির অস্থির চিত্তে প্রলোভনের একটা নূতন ছাপ দাগিয়া দিয়াছিল।

পরদিন সন্ধ্যা পূজা সারিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় হিমাদ্রি আসিয়া দরজাটি জুড়িয়া দাঁড়াইল; তাহার হাতে ছিল একখানা সুদৃশ্য বাঁধানো বই।

সন্ধ্যা তাহাকে দেখিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—দেখছি, আপনার ওপরেও দেবীর দয়া হয়েছে।

হিমাদ্রি তাহার বদ্ধদৃষ্টি আরো খর করিয়া ও ওষ্ঠাধরে চাপা-হাসির একটা ঝিলিক তুলিয়া বলিল,—কেন বলুন তো,—আজও এখানে এসেছি বলে? কিন্তু দেবীর অসীম দয়া তাঁর এই বিদ্রোহ ভক্তটি আজ পর্য্যন্ত পেয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না!

সন্ধ্যা জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—আমি হয়তো ভুল বুঝেছিলুম। আপনার হাতে বই দেখে মনে করেছিলুম, বুঝি ওই থেকে কোনো স্তবস্তোত্র দেবীকে পড়ে শোনাতে এসেছেন।

হিমাদ্রি সন্ধ্যার কথায় একটু সাহস পাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল,—আপনার এ অনুমান একেবারে মিথ্যা নয়,—কেননা, এক প্রত্যক্ষ দেবীর জন্যই এখানা একান্ত আগ্রহের সঙ্গেই এখানে এনেছি।—কথাটা শেষ করিয়াই সে সন্ধ্যার মুখের দিকে একবার চাহিল।

সন্ধ্যা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কথা কয়টি সে কি ভাবে গ্রহণ করিল তাহার কোনো আভাষ না পাইয়া হিমাদ্রি বলিল,—এই বইখানা আপনাকে উপহার দেব বলেই এনেছি, বুঝলেন?

সন্ধ্যা মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল,—কি বই ও-খানা?

হিমাদ্রি বলিল,—শরৎবাবুর গৃহদাহ, নতুন বেরিয়েছে।

সন্ধ্যার মনে হইল, তাহার কর্ণমূলের ভিতর দিয়া একটা তপ্ত রক্তস্রোত মস্তিষ্কের ভিতর ছুটিয়া উঠিতেছে! কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসুভাবে হিমাদ্রির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—বেছে বেছে শরৎবাবুর এই বইখানাই হঠাৎ আমাকে উপহার দিতে এনেছেন, কি উদ্দেশ্যে হিমাদ্রিবাবু?

হিমাদ্রি চমকিত হইয়া বলিল,—কেন বলুন তো? অন্যায় কিছু করে ফেলেছি নাকি? শরৎবাবুর বই আপনি ভালবাসেন, তাই না এই বইখানা নতুন বেরিয়েছে শুনেই আপনার জন্যে আনিয়েছি।

সন্ধ্যা নিজেকে সংযত করিয়া গম্ভীর মুখে বলিল,—কিন্তু আনাবার এই সাধু উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হবার কোনো লক্ষণই তো দেখা যাচ্ছে না, হিমাদ্রিবাবু! সন্ধ্যা যে গৃহদাহের 'অচলা' কোনো দিন হয়নি, বা, পরেও হবে না,—এই ছয়টি মাসের সংশ্রব থেকে এ সত্যটুকু বোধ হয়, আপনি অনুমান করতে পেরেছেন!

সন্ধ্যার এই স্পষ্ট কথায় হিমাদ্রির চিত্ত ব্যথায় ভরিয়া উঠিল না, বরং ভিতরের একটা সুপ্ত কামনা সহসা সচেতন হইয়া ব্যগ্র উল্লাসে সাড়া দিল! সে লোলুপ-দৃষ্টিতে সন্ধ্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—এ বইখানাও যে তোমার পড়া আছে তা আমি জানতাম না; কিন্তু এই সূত্রে তুমি যে আমার মনস্তত্ত্বটুকু বিশ্লেষণ করতে পেরেছ, তা জানতে পেরে আমি যেমন চমৎকৃত হয়েছি, সেই পরিমাণে মুগ্ধও হয়েছি;—সত্যই কি আমার কোনো আশাই নেই সন্ধ্যাদেবী?

সন্ধ্যার মুখ দিয়া কোনো কথাই বাহির হইল না, মুখখানা সেই ভাবেই গম্ভীর হইয়া রহিল, দুই চক্ষুর উদাস দৃষ্টিতে একটা অব্যক্ত বেদনার ভাব শুধু ব্যক্ত হইয়া উঠিল।

হিমাদ্রি উৎসাহিত হইয়া সন্ধ্যার দিকে অগ্রসর হইতেই সে তাহার সেই ম্লান উদাস দৃষ্টি চকিতে উজ্জ্বল করিয়া বলিয়া উঠিল,—থামুন আপনি, আর এদিকে এগুবেন না।

হিমাদ্রি চমকিত হইয়া দাঁড়াইতেই, সন্ধ্যা দৃপ্তস্বরে বলিল,—আপনি ভাবছেন, গৃহদাহের 'সুরেশ' আপনার কাঁধের ওপর চেপে বসেছে, কিন্তু

আমি দেখছি, ঐ অসুরের কদর্য্য মুখখানা সেখানে কে হুবহু বসিয়ে দিয়েছে!

দংশনোদ্যত কালসর্পের ভয়াবহ ফণার উপর কে যেন মুহূর্ত্তমধ্যে এক ঝলক কার্ব্বলিক অ্যাসিড ঢালিয়া দিল! হিমাদ্রির মনে পড়িয়া গেল, সেই সন্ন্যাসীর এই ধরণের একটা ভীতিপ্রদ রূঢ় কথা; যাহা এতদিনেও সে ভুলে নাই এবং এখনও মধ্যে মধ্যে নিশীথ স্বপ্নের আখ্যান-বস্তু-রূপে তাহাকে ভয়চকিত করিয়া তুলে!

হাতের বইখানা সজোরে সে অসুরের মূর্ত্তিটির উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—ড্যাম ইট্! পরক্ষণে সন্ধ্যার দিকে রোষদিগ্ধদৃষ্টিতে একবার চাহিয়াই সে ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

যে ভয়াবহ মূর্ত্তিটি মধ্যে মধ্যে অস্পষ্টভাবে স্বপ্নের আশ্রয় লইয়া হিমাদ্রির সুখ-নিদ্রার বিঘ্নস্বরূপ হইত,—এইদিন হইতে প্রায় প্রত্যেক রজনীতেই সেটি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে স্বপ্নের সাথী হইয়া উঠিয়া তাহার সুপ্তি-সুখ ভঙ্গ করিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই অবস্থা এরূপ হইয়া দাঁড়াইল যে, জাগ্রত অবস্থাতেও সময় সময় সে আতঙ্কিত হইয়া পড়িত, কোনও প্রসঙ্গে ইহা তাহার স্মৃতিপথে জাগরিত হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইলেই স্বপ্নদৃষ্ট সেই ভয়াবহ অসুরের মুখ তাহার চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিত।

সাত

সন্ধ্যার কাছে হিমাদ্রির আসল রূপ প্রকাশ হইয়া পড়িলেও সে কিছুমাত্র লজ্জা বা অপ্রস্তুতের ভাব ব্যক্ত করে নাই। সেদিনকার ব্যাপারটাকে একবারে উড়াইয়া দিয়াই সে সহজ-স্বচ্ছন্দভাবেই মেলা-মেশা করিয়া চলিল। সন্ধ্যা এই ছদ্মবেশী সয়তানটিকে মর্ম্মে মর্ম্মে চিনিয়াও তাহার সংস্পর্শ এড়াইবার কোনও উপায়ই উদ্ভাবন করিয়া উঠিতে পারে নাই। স্বামীকে উপর্য্যুপরি পত্র লিখিয়াও সে তাহার কোনও উত্তর পায় নাই,—বড়লোকের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র উঠিবার জন্য দাদামহাশয়কে বারংবার জানাইলেও, তিনি কোন সম্মতিসূচক সাড়া দেন নাই। কাজেই সে নিরুপায় হইয়া তাহার সেই উপাস্য ইষ্টদেবীর চরণেই আত্মসমর্পণ করিয়া আর্ত্তস্বরে আবেদন জানাইয়াছিল,—

"শরণাগতাহং করুণায় বিশ্বেশ্বরী ত্রাহি মাম্"।

সেদিন পূজা সারিয়া ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিয়াই সন্ধ্যা দেখিল, হিমাদ্রি একা বসিয়া আছে। সে একটু বিস্মিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল,—এঁরা সব কোথায়?

হিমাদ্রি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সন্ধ্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—বুড়ানাথের মন্দিরে গেছেন; আজ সেখানে মস্ত মেলা!

আমাকে সঙ্গে না নিয়েই তাঁরা চলে গেছেন?

আপনার পূজা সারতে দেরী হবে মনে করেই তাঁরা বেরিয়ে পড়েছেন। আর আপনি তো বাইরে যাওয়াটা তত পছন্দ করেন না!

হিমাদ্রির এ কথায় কোনো মনোযোগ না দিয়া সন্ধ্যা একটু ব্যস্তভাবেই

বলিল,—আমিও মন্দিরে যাব ; দয়া করে চাকরদের কাউকে বলে দিন, একখানা গাড়ী নিয়ে আসে—

হিমাদ্রি বলিল,—গাড়ী আনাবারও দরকার ছিল না, সে সবই মজুত, কিন্তু চাকর-বাকর কেউ নেই, সবাই এবেলা ছুটি নিয়ে মেলায় গেছে। এই বিশাল পুরীতে আমরা দুটি প্রাণী মাত্র পড়ে আছি !

সন্ধ্যা একবার হিমাদ্রির মুখের দিকে চাহিল, শিকার আয়ত্ত করিয়া বাঘ যেভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে, হিমাদ্রির দৃষ্টিতে সে তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিল। কোনও উত্তর না দিয়াই সে বাহিরে যাইবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিমাদ্রি ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইয়া ড্রয়িং রুমের মুক্তদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া সন্ধ্যার ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পরস্পর চোখোচোখি হইতেই হিমাদ্রি শ্লেষের স্বরে বলিল,—মানুষ বরাবরই যেমন ভুল করে না, তেমনই সঙ্কোচ চিরদিনই তাকে ঠেকিয়ে রাখে না,—কি বল সন্ধ্যা দেবী ?

সন্ধ্যার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল,—জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল,—আপনার মতলব কি হিমাদ্রি বাবু ?

হিমাদ্রির মুখের উপর ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল,—সমস্ত জেনে আর ন্যাকামী নাই বা করলে সন্ধ্যা দেবি ! মতলব আমার বুঝতে পার নি ?—সত্যি ?

বলিতে বলিতে হঠাৎ সে সন্ধ্যার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া চাপিয়া ধরিল, সঙ্গে-সঙ্গে আর একটি হাত দিয়া তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া আবেগ কম্পিত স্বরে বলিল,—'গৃহদাহে'র সুরেশ এমনি করেই একদিন অচলাকে জয় করেছিল—

সন্ধ্যা এই আকস্মিক আক্রমণে বিহ্বল না হইয়া, তাহার মুক্ত হাতখানি প্রসারিত করিয়া হিমাদ্রির কাঁধের উপর যুযুৎসুর এমন একটা কৌশল প্রয়োগ করিল যে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া গেল। সন্ধ্যাও ঠিক এই সময় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিল,—সেই অসুরের মুখ আপনার কাঁধের ওপর! ঐ আয়নার দিকে চেয়ে দেখুন—

সম্মুখেই সুবৃহৎ মুকুর। তাহার উপর দৃষ্টি পড়িতেই হিমাদ্রি ভূতাবিষ্টের মত চমকিয়া শিহরিয়া উঠিল! কি সর্ব্বনাশ! সত্যই তো, তাহার কাঁধের উপর ঠাকুরঘরের সেই অসুরের ভয়াবহ মুখ! দুই চক্ষু রগড়াইয়া সে পুনরায় আয়নার উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল,—আতঙ্কে অভিভূত হইয়া দেখিল—সেই অসুরের মুখ! যে মুখ তাহার শয়নে স্বপনে অবিরাম সাথী!

আজ আর সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না,—হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য হইয়া, ড্রয়ার হইতে রিভলবার বাহির করিয়া মুকুরে প্রতিফলিত মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়িল।

গুলির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মুকুরের কাচ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গুলির মত বেগে হিমাদ্রির মুখে চোখে কণ্ঠে হাতে ভীষণভাবে বিদ্ধ হইয়া গেল। মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় একটা তীব্র আর্ত্তনাদ তুলিয়া সে কক্ষতলে আস্তৃত কারপেটের উপর লুটাইয়া পড়িল।

* * *

সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতে হিমাদ্রি অনুভব করিল, সে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছে, তাহার চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, সর্ব্বাঙ্গ ব্যথায় আড়ষ্ট! ক্ষীণকণ্ঠে সে বলিল,—আমি কোথায়?

অপরেশ তাহার পার্শ্বে-ই বসিয়াছিল। ধীরে ধীরে বলিল,—তোমার ঘরেই আছ ; বেশী কথা ক'য়ো না, মাথা তোলবার চেষ্টা ক'রো না।

স্বর শুনিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কম্পিতকণ্ঠে বলিল—কে, অপরেশ নাকি ?

হ্যাঁ, আমি অপরেশ।

আমি কতকক্ষণ এভাবে আছি ?

ঘণ্টা পাঁচেক হবে।

তুমি কতকক্ষণ এসেছ, অপরেশ ?

অ্যাকসিডেণ্টের কিছু পরেই।

এ-ঘরে আর কে কে আছে ?

ডাঃ বোস, আর নার্স আছেন।

ডাঃ বোস এই সময় প্রশ্ন করিলেন,—কি হয়েছিল বলুন তো।

হিমাদ্রি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর আস্তে আস্তে সহজ সুরেই বলিল,—একটা ভীমরুলকে তাক্ করেছিলাম, এটুকু মনে আছে। আয়নাটার মাথার ওপর সে বসেছিল।

ডাক্তার বোস বলিলেন,—সিভিল সার্জ্জনও এইরূপ একটা অনুমান করেছেন। খেলায় ছলে তাক্ করতে গিয়ে গুলিটা আয়নার ওপর পড়ে, তাইতেই এই অ্যাকসিডেণ্ট—

চোখ দুটো নিশ্চয়ই গলে গেছে,—কি বল ডাক্তার? ডাক্তার বলিলেন,—ওসব চিন্তা এখন ছেড়ে দিন,—চুপটি করে কিছুদিন শুয়ে থাকুন, সেরে উঠবেন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হিমাদ্রি চুপ করিয়া রহিল।

* * *

রাত্রি তখন আটটা। হিমাদ্রি কিছুক্ষণ আচ্ছন্নভাবে পড়িয়াছিল। সহসা সজাগ হইয়া ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল,—অপরেশ ?

আস্তে আস্তে তাহার গায়ে হাত দিয়া অপরেশ বলিল, কি, ভাই ?

এ-ঘরে এখন আর কে আছে ?

আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

নার্স ?

সে এই মাত্র খেতে গেছে।

তুমিই একা সজাগ-প্রহরী হয়ে শিয়রে বসে আছ অপরেশ ? আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ? ঠিক্ উত্তর দেবে ?

সাধ্যমত চেষ্টা করব।

এ দুর্ঘটনার মূলতত্ত্ব তুমি জান ?

জানি।

সন্ধ্যা তোমাকে আদ্যোপান্ত সব বলেছে ?

হাঁ।

তবু তুমি এ পাষণ্ডের পাশে বসে আছ ?

বন্ধুর বিপদে বন্ধু যে বুক দিয়ে পড়বে—এতে তো আশ্চর্য্যের কিছু নেই ভাই।

সন্ধ্যা কি আমাকে ক্ষমা করেছে ?

সর্ব্বান্তঃকরণে। এতক্ষণ সেও এখানে ছিল, নার্সকে খাওয়াতে নিয়ে গেছে।

মনে মনে একটা তৃপ্তি অনুভব করিয়া পরক্ষণে গাঢ়স্বরে হিমাদ্রি প্রশ্ন করিল,—আর, তুমি ?

আর্ত্তস্বরে অপরেশ বলিল,—নিজের চোখ দুটো তুলে দিলে যদি

তোমার চিকিৎসা সার্থক হত, তাতেও আমি কিছুমাত্র দ্বিধা করতুম না, বন্ধু!

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতখানি অপরেশের কোলের উপর রাখিয়া হিমাদ্রি ব্যথার স্বরে বলিল,—আজ বুঝছি অপরেশ, সত্যিকার সতীর দিকে কু-নজর দিলে তার কি শাস্তি! চোখ দুটো গেছে জানছি, কিন্তু তার দৃষ্টি তো এখনো ঠিক আছে!—সর্ব্বক্ষণ কি দেখছি জান? সেই সেই—অসুরের মুখ! আর তার মাথার ওপর পা-দুখানি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং—জাগ্রতা ভগবতী!

জাগ্রতা ভগবতী

শিখা

দুই

১

শীত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কাশীধামে শিবরাত্রির বিষাণ বাজিয়াছে,—শিবপুরী ভক্তবৃন্দের জয়ধ্বনিতে মুখর। দুর্গাপূজা ও বড়দিনের বিরাট পর্ব্ব ফতে করিয়া, কাশীর যে সকল দোকানদার বাড়ীওয়ালা, গোয়ালা, গাড়োয়ান, কুলী, গাঁটকাটা প্রভৃতি মাস দুই তিন নিঝুম হইয়া ঝিমাইতেছিল, তাহারা আবার পরিপূর্ণ উৎসাহে কোমর বাঁধিয়া উপায়ের আসরে অবতীর্ণ।

শিবরাত্রির সাত আট দিন পূর্ব্বে—ডেরাডুন এক্সপ্রেসখানি যখন কাশী ষ্টেশনে আসিয়া থামিল, তখন গাড়ীগুলির ভিতরের অবস্থা দেখিয়া, ষ্টেশনের অসমসাহসী এবং এরূপ দৃশ্যদর্শনে সদা অভ্যস্ত অসীমসহিষ্ণু কর্ম্মচারিগণ চমকিত হইলেন। যাত্রি-বন্ধু কুলী ও শিকারে সমাগত পাণ্ডাপ্রভুগণ পরম পুলকিত মনে ব্যোম্ ভোলানাথের নামে জয়ধ্বনি করিয়া ট্রেণ হইতে অবতরণে তৎপর জনস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ট্রেণের শেষভাগে একখানি রিজার্ভ করা মধ্যম শ্রেণী হইতে পাঁচ জন মাত্র প্রাণী প্লাটফরমে অবতরণ করিলেন। সে দিকে কুলী ও পাণ্ডার দৃষ্টি তখনও পড়ে নাই। কাশী ষ্টেশনে গাড়ী দুই তিন মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না, কাযেই এই পাঁচটি প্রাণীর কর্ত্তা কুলীর পাত্তা না পাইয়া নিজেই ভৃত্যের সহায়তায় নিতান্ত ব্যস্তভাবে মালপত্র নামাইতে লাগিলেন।

কর্ত্তার স্ত্রী, তরুণী কন্যা ও পরিবারস্থ আর একটি প্রৌঢ়া মহিলা যথাসাধ্য সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন।

যাত্রী যাইবার গেটের নিকট সাতাশ আটাশ বৎসরের এক ভদ্রবেশী যুবক দাঁড়াইয়া ছিল, সহসা তাহার দৃষ্টি এ দিকে পড়িল; সে তখনই সবেগে সেই রিজার্ভ কামরার সম্মুখে আসিয়া প্রথমেই বক্রদৃষ্টিতে তরুণী কন্যার অপূর্ব্ব মুখখানি দেখিয়া লইল। পরক্ষণে কামরার দিকে চাহিয়া ব্যস্তভাবে নিতান্ত পরিচিতের মত বলিল,—'তাই ত, অনেকগুলো মাল যে এখনও রয়েছে দেখছি! ব্যস্ত হবেন না আপনারা, আমি সব নামিয়ে দিচ্ছি—'

যুবক তৎক্ষণাৎ গাড়ীর মধ্যে ক্ষিপ্রভাবে প্রবেশ করিয়া সুকৌশলে অবশিষ্ট মালগুলি নামাইতে আরম্ভ করিল। ইতোমধ্যে গার্ডের বংশীধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু সেই সাহসী যুবক গতিশীল ট্রেণের কামরা হইতে সুশৃঙ্খলে অবশিষ্ট দুইটি ট্রাঙ্কও নামাইয়া ফেলিল।

সপরিবার কর্ত্তাটি প্রশংসমান নয়নে এই পরোপকারী প্রিয়-দর্শন যুবার দিকে চাহিয়া ছিলেন। কর্ত্তা সস্নেহে এইবার তাহার কাঁধের উপর হাতখানি রাখিয়া অতি মিষ্টস্বরে বলিলেন,—"বাবা, তুমি আজ যে উপকার করলে—"

বাধা দিয়া অতি বিনীতভাবে যুবক বলিয়া উঠিল,—"বিলক্ষণ! কি বলছেন আপনি? এই হাত দুখানাকে আপনার কাযে একটু লাগিয়ে দিয়েছি, এই মাত্র। এতে পয়সা খরচও হয় নি, কষ্টও বিশেষ কিছু করি নি; এ যদি না করব, তা হ'লে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন?"

কথাগুলি সুষ্ঠু অঙ্গভঙ্গির সহিত অতি হৃদয়গ্রাহিরূপে উদ্গার করিয়াই যুবা অদূরে দণ্ডায়মানা তরুণীর দিকে আর একবার বক্রদৃষ্টিতে

চাহিল। তরুণীও তাহাদের সাহায্যকারী এই মিষ্টভাষী যুবার দিকে চাহিয়া তাহার অপূর্ব্ব ভঙ্গিপূর্ণ কথাগুলি নিবিষ্টমনেই শুনিতেছিল; যুবার বক্রদৃষ্টি তাহার মুখের উপর পড়িবামাত্র তরুণী দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

কর্ত্তা যুবকের কথায় মুগ্ধ হইয়া বলিলেন,—"তুমি প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে চলন্ত ট্রেণ থেকে জিনিস নামিয়ে এনেছ; জানা নেই, চেনা-পরিচয় নেই, তবু তোমার এত দরদ! বাবা বিশ্বনাথ তোমার স্বাস্থ্য অটুট রাখুন। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি বাবা,—তোমরা?"

ঈষৎ হাসিয়া যুবা বলিল,—"কুন্ঠিত হয়ে এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন, বলুন ত?"

সহাস্যে কর্ত্তা বলিলেন,—"বলতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই বাবা, আজকাল শুনতে পাই, নাম আর জাতের কথা জিজ্ঞাসা করা নাকি অভদ্রতা।"

যুবা বলিল,—"এ কথা মিথ্যে নয়। কাশীতেও এ রোগ ঢুকেছে; কিন্তু আমি সে দলের নই। আমার নাম—শ্রীগোবর্দ্ধন রায়, জাতি ব্রাহ্মণ।"

সসম্ভ্রমে ও সশ্রদ্ধায় কর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন,—"ব্রাহ্মণ? তা হ'লে প্রাতঃপ্রণাম হই, রায় মশাই।"

গৃহিণী এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, এইবার তিনিও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, তাঁহার দেখাদেখি প্রৌঢ়া মহিলাটি, এমন কি, ভৃত্যও ব্রাহ্মণ-উদ্দেশ্যে কঙ্করময় প্লাটফরমে কপাল ঠেকাইয়া লইল। গৃহিণী বলিলেন, "শিখা, তুই চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্? বাবাকে গড় করলি নি?"

কর্ত্তার এই তরুণী কন্যার নাম শিখা; বয়স একুশ বাইশ হইবে।

পরিপূর্ণ অটুট স্বাস্থ্য ও উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্যের জোয়ার তাহার দেহে তরঙ্গায়িত হইতেছিল।

মায়ের কথায় কন্যার অপাঙ্গে হাসির একটা ছটা খেলিয়া গেল! কয়েক মুহূর্ত্তের পরিচয়ে এই অপরিচিত যুবাটিকে একেবারে দেবতার আসনে তুলিতে দেখিয়া সম্ভবতঃ শিখা চমৎকৃত হইয়া থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে এ জন্য সে একটু কৌতুকও অনুভব করিতেছিল। মাতৃবাক্যে শিখা একবার কৌতুকভরা নেত্রে এই নূতন দেবতাটির উপর একটি কটাক্ষ করিয়া, নবনীত-কোমল সুগৌর করযুগল সীমন্তে তুলিয়া দেবতার মর্য্যাদা রক্ষা করিল।

২

গোবর্দ্ধন কয়েক জন কুলীকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত মালপত্র তাহাদের মাথায় চাপাইয়া, কর্ত্তা ও তাঁহার পরিজনগণকে লইয়া প্লাটফরমের বাহিরে ষ্টেশনের হাতায় আসিয়া দেখিল, একখানি গাড়ীও খালি নাই; অথচ, বহু যাত্রী মালপত্র লইয়া পথের উপর গাড়ীর অভাবে অবসন্নভাবে বসিয়া আছে।

কর্ত্তা বলিলেন,—"এখন উপায়?"

গোবর্দ্ধন জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনারা কোথায় উঠবেন স্থির করেছেন, আগে তাই বলুন ত?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"স্থির কিছুই করিনি, রায় মশাই,—বিশ্বনাথের টানে বেরিয়ে পড়েছি। বাঙ্গালীটোলায় গিয়ে একটা বাসা-টাসা ভাড়া ক'রে নেবার ইচ্ছা আছে। এখন গাড়ী ত পাওয়া যাচ্ছেনা, সঙ্গে এই সব লটবহর, যাই কি ক'রে?"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"বড়ই ভুল করেছেন, কর্ত্তা মশাই; পূজায়, বড়-দিনে, গ্রহণে আর শিবরাত্রির সময় কাশীতে বাড়ী খালি পাওয়া দায়; আগে থাকতে বাড়ীর ব্যবস্থা না ক'রে যাঁরা কাশীতে সপরিবারে আসেন, তাঁদের খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হয়।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"পয়সার জন্যে কিছু আসে যাবে না, রায়মশাই। যেমন তেমন একখানা বাড়ী পেলেই হ'ল! এখন ভাবনা এই—যাওয়া যায় কি করে? বেলাও ক্রমশঃ বাড়ছে।"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"এক কায করা যাক্, কর্ত্তা মশাই। গাড়ী এখন

পাওয়া যাবে না। কাছেই গঙ্গা, চলুন, আপনাদের নৌকা ক'রে পৌঁছে দিই।"

কুলীরাও গোবর্দ্ধনের এই সমীচীন উক্তির সমর্থন করিল। নৌকা করিয়া গঙ্গার উপর দিয়া গঙ্গাতটবর্ত্তী ঘাটগুলি দেখিতে দেখিতে যাইবার কল্পনায় কর্ত্তা ও গৃহিণী অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কর্ত্তা গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা বিশ্বনাথ তোমাকে মিলিয়ে দিয়েছেন!"

গঙ্গা-সৈকতে এই যাত্রিদল অবতরণ করিতে না করিতেই মাল্লার দল তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল। কর্ত্তা দশাশ্বমেধ-ঘাটে নামিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবামাত্র মাল্লারা স্ব স্ব নৌকা দেখাইয়া দর হাঁকিতে লাগিল;—দশ টাকা হইতে পাঁচ টাকায় দর নামিল। শেষে গোবর্দ্ধন একজন পরিচিত মাল্লার হাত ধরিয়া একটু তফাতে লইয়া গিয়া বিজ্ঞের মত কি কথাবার্ত্তা কহিল, পরক্ষণে তাহাকে রাজী করাইয়া কর্ত্তার নিকট আসিয়া বলিল,—"এরই নৌকায় উঠুন কর্ত্তা,—তিন টাকা দেবেন।"

কর্ত্তা সানন্দে সপরিবারে নৌকায় উঠিলেন। গোবর্দ্ধন বিশেষভাবে তদ্বির করিয়া মালপত্র উঠাইয়া দিল। কুলীরা এহেন গুরু কার্য্য সমাধার দক্ষিণাস্বরূপ দশ টাকা চাহিল।

সবিস্ময়ে কর্ত্তা বলিলেন,—"দশ টাকা!"

গোবর্দ্ধন কর্ত্তার পাশে গিয়া চুপি চুপি বলিল,—"আপনি এদের সঙ্গে দর কশাকশি ক'রে পারবেন না, আমাকে গোটা তিনেক টাকা দিন দেখি,—এক টাকার রেজকি বরং দেবেন।"

বিনা বাক্যব্যয়ে কর্ত্তা পকেট হইতে দুইটা টাকা, একটা আধুলি ও আটটা আনি বাহির করিয়া গোবর্দ্ধনের হাতে দিলেন। গোবর্দ্ধন কুলীদের ডাকিয়া পূর্ব্বোক্ত সোপান ধরিয়া রাস্তার উপর উঠিল এবং চারি

জন কুলীকে মিঠে-কড়া কথায় বাধ্য করিয়া আধুলিটি মাত্র দিয়া বিদায় করিল। তাহার পর নৌকার কাছে আসিয়া কর্ত্তার হস্তে ছয়টী আনি ফেরৎ দিয়া বলিল,—"বেটারা সব পেয়ে বসেছে। আর কলকেতার বাবুরাই ত এদের লোভ বাড়িয়ে দিয়েছে! পাঁচ টাকার কমে কিছুতেই নেবে না,—জোর জবরদস্তি ক'রে দুটাকা দশ আনা দিয়ে বিদেয় করেছি।"

কর্ত্তা প্রসন্নভাবে বলিলেন, "বেশ করেছ, বাবা,—এখন তা হ'লে বিশ্বনাথের নাম নিয়ে রওনা হওয়া যাক।"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"আমারও কি সঙ্গে যাবার দরকার হবে, কর্ত্তা মশাই?"

কর্ত্তা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন,—"সে কি বাবা! কষ্ট যখন গোড়া থেকেই ক'রে আসছ, তখন ত সহজে তোমাকে নিষ্কৃতি দিচ্ছি না। বিশ্বনাথ তোমাকেই যে আমাদের অভিভাবক ক'রে পাঠিয়েছেন, বাবা!"

কর্ত্তা বলিলেন,—"কাশীতে আমরা এই প্রথম আসছি, পথঘাট কিছুই জানি না; তোমাকে কষ্ট দেওয়া হবে, তা জেনেও হঠাৎ ত ছাড়তে সাহস পাচ্ছিনা, বাবা! বিশেষ ক্ষতি হবে কি আমাদের সঙ্গে বাঙ্গালীটোলা পর্য্যন্ত গেলে?"

গোবর্দ্ধন কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবিয়া লইয়া ঈষৎ কুণ্ঠার সহিত বলিল,—"না, এমন বিশেষ কিছু ক্ষতি হবার নয়। আমার যা কায, তা পরে করলেও চ'লে যাবে; আর আমার বাসাও বাঙ্গালীটোলায়; তা চলুন।"

অতঃপর গোবর্দ্ধন নৌকায় উঠিল।

৩

কথায় কথায় কৌশলক্রমে গোবর্দ্ধন কর্ত্তার পরিচয় জানিয়া লইল। কর্ত্তার নাম—রাজীবলোচন মণ্ডল, জাতিতে মাহিষ্য, কলিকাতার সান্নিধ্যে ইঁহার জমিদারী, কলিকাতাতেও ভূসম্পত্তি ও কয়েকখানি বড় বড় বাড়ী আছে। ইঁহারা নবাবী আমোলের প্রাচীন জমিদার, নাম-ডাক যথেষ্ট। কলিকাতাতেই বেশীর ভাগ থাকেন।

গোবর্দ্ধন বলিল,—"আমিও চব্বিশ পরগণার লোক, আমার আদি নিবাস বেহালায়। আপনার নাম আমি আগেই শুনেছি। ও-অঞ্চলে আপনাদের কত সব কীর্ত্তি! আজ আপনাকে দেখে আমি ধন্য হয়েছি।"

রাজীবলোচন বলিলেন,—"অমন কথা ব'লনা, বাবা। ঈশ্বর আমাকে একটু ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন বলেই যে আমাকে দশ ধাপ উঁচুতে তুলে আমার সঙ্গে সসম্ভ্রমে কথা কইতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বিশেষতঃ তুমি ব্রাহ্মণ,—পুরুষানুক্রমে আমরা ব্রাহ্মণকে দেবতার মত ভক্তি ক'রে আসছি, তুমিও সেই ব্রাহ্মণ! আমিই ধন্য হয়েছি কাশীতে এসে প্রথমে ব্রহ্মদর্শন ক'রে।"

গোবর্দ্ধন সসম্ভ্রমে বলিল,—"আপনি বনেদী বংশের বংশধর, তাই আপনার মুখে এ কথা শুনতে পেলুম। আপনি অতি মহৎ, অতি সজ্জন, অতি ভাগ্যবান্।"

রাজীবলোচন শিহরিয়া উঠিলেন, গাঢ়স্বরে বলিলেন,—"ভুল বলেছ বাবা, ভুল! আমি অতি হীন, অতি অধম, অতি দুর্ভাগ্য! আমার দুঃখের কথা শুনলে পাষাণও গ'লে যায় বাবা—"

সবিস্ময়ে গোবর্দ্ধন বলিল,—"সে কি?"

রাজীবলোচন বলিতে লাগিলেন,—"শুধু পয়সা থাকলেই কি মানুষ ভাগ্যবান্ হয় মনে কর? ভগবান্ আমাকে পয়সা দিয়েছেন, নাম দিয়েছেন, মানসম্ভ্রম দিয়েছেন যথেষ্ট; কিন্তু শান্তি মোটেই দেননি। ঐ মেয়েটি দেখছ, এই আমার একমাত্র সন্তান, আমি একে ছেলের মত আদরে মানুষ করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি; রূপবান্ বিদ্বান্ পাত্রের হাতেও একে সম্প্রদান করেছি। জামাইকে আমি কাছে রেখে জমিদারীর কায শিখাচ্ছিলাম। অমন বাধ্য সুশীল মেধাবী ছেলে সচরাচর দেখা যায় না; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে কলকেতায় যেই নন-কো-অপারেশনের হুজুগ উঠল, অমনই জামাই আমার দুই ছত্রের একখানি চিঠিতে—দেশের ডাকে চল্‌লেম—লিখে—বিরাগী হয়ে পালিয়ে গেল! সেই থেকে তার কোন সন্ধান নেই। খুঁজতে কোথাও বাকী রাখিনি। আমাদের এই যে কাশীতে আসা—শুধু শিবরাত্রি দেখার উদ্দেশ্যে নয়,—এই কাশীতেই সে লুকিয়ে আছে, এ কথা কোন সূত্রে জান্‌তে পেরে, শিবরাত্রিকে উপলক্ষ ক'রে এখানে এসেছি, বাবা।"

গোবর্দ্ধনের মনোরাজ্যে এতক্ষণ এক অপূর্ব্ব ভাবের তরঙ্গ বহিতেছিল। বৃদ্ধের কথা-প্রসঙ্গে শিখার সঙ্কোচশূন্য আরক্ত মুখখানির উপর সে ঘন ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল—যেন এই পতিপরিত্যক্তা তরুণীর মর্ম্মন্তুদ কাহিনী তাহাকে কতই না অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে! বৃদ্ধের কথা শেষ হইবামাত্র সে আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল,—"অ্যাঁ!—বলেন কি? আহা-হা—এমন দেবীর মত স্ত্রীকে তিনি পরিত্যাগ ক'রে গেলেন! আচ্ছা, আপনি বল্‌লেন, তিনি কাশীতেই আছেন শুনেছেন; তাঁর নামটা কি? চেহারা কি রকম বলুন ত?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"অরিন্দম হালদার তার নাম। দিব্যি লম্বা-চওড়া চেহারা, গৌরবর্ণ, খুব বলবান্। বয়েস এত দিনে হবে প্রায় আটাশ-উনত্রিশ বছর, কাণ দুটো খুব বড় বড়—"

সোৎসাহে গোবর্দ্ধন বলিল, "নাকটাও বাঁশীর মত বেশ লম্বা কি, আর মাথায় চুল খুব বড়, বাউরীর মত ঘাড় পর্য্যন্ত লতানো ?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "হাঁ, নাকটা লম্বা বটে, কিন্তু চুল সে বরাবরই ছোট ক'রে কাটত, আর গোঁফটাও রাখত না, তা, তুমি কি বাবা—"

গোবর্দ্ধন বলিল, "তা হ'তে পারে, হয় ত চুল এখন বড়ই রেখেছেন ; কিন্তু ঠিক এই চেহারার একটি লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে ; আমার খুব বিশ্বাস—"

সকলের চক্ষুই এখন গোবর্দ্ধনের মুখের উপর, সবাই উদ্‌গ্রীব। বৃদ্ধ বলিলেন,—"সে কোথায় থাকে, বাবা ? এখনও আছে এখানে ?"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"তিনি কোথায় থাকেন, তা ঠিক বল্‌তে পার্‌ব না, কেন না, তিনি এক স্থানে থাকেন না ; তবে কাশীতে বছরের অর্দ্ধেকেরও বেশী থাকেন। আমাকে তিনি ছোট ভায়ের মত ভালবাসেন, আর কাশীতে এলেই, দয়া ক'রে আমার বাসাতেই ওঠেন। তাঁর আগেকার নাম বা পরিচয় সম্বন্ধে কিছুই বলেন না, বল্‌তে মোটেই চান না। এখন তাঁর নাম ইন্দ্র স্বামী। দেশের কাযেই তিনি নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান, এও শুনেছি ; অন্নকূটের পর তিনি কাশী থেকে চ'লে গেছেন, খুব সম্ভব এই শিবরাত্রিতেই আবার আসবেন ; এবার এলেই সব জানা যাবে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনাদের জামাইকে খুঁজে বার করবই —যদি তিনি কাশীতে থাকেন।"

গৃহিণী গদ্‌গদস্বরে বলিলেন,—"এমন দিন কি হবে ? হয় ত শিথার

আমার দুঃখের অবসান হয়েছে,—বাবা বিশ্বনাথ, মা অন্নপূর্ণা বুঝি এত দিনে মুখ তুলে চেয়েছেন, নইলে আমরাই বা হঠাৎ কাশীতে আসব কেন, আর বাবা, তোমার সঙ্গেই বা এ ভাবে পথে দেখা-সাক্ষাৎ হবে কেন? আশীর্ব্বাদ কর বাবা, তোমার কৃপাতেই যেন আমরা আমাদের হারানিধি ফিরে পাই।"

রাজীবলোচন বিশ্বনাথের উদ্দেশে করযুগল মস্তকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন,—"সবই বিশ্বনাথের ইচ্ছা।"

৪

দ্বিপ্রহর হয় হয়, এমন সময় নৌকা আসিয়া দশাশ্বমেধ-ঘাটে ভিড়িল। গোবর্দ্ধন আরোহিগণকে কিছুক্ষণ নৌকায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাসার সন্ধান করিতে নৌকা হইতে নামিয়া পড়িল। ঘাটের উপর দিয়া রাস্তায় উঠিয়া সে একবার নৌকার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, কর্ত্তাকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"ব্যস্ত হবেন না, এখনই বাসা ঠিক ক'রে আমি লোকজন নিয়ে আস্‌ছি।"

অতঃপর দ্রুতপদে সে কালীতলায় আসিয়া মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইল; পকেট হইতে একটি পয়সা বাহির করিয়া মায়ের পদতলে নিক্ষেপ করিয়া করযোড়ে করুণস্বরে ডাকিল,—"মা, তোমারই প্রসাদে আজ আমার সুপ্রভাত। জবর শিকার জুটিয়ে দিয়েছ মা, দেখো মা! যেন শেষরক্ষা হয়—মনস্কামনা আমার সিদ্ধ হয়।"

কালীতলার সম্মুখ দিয়া খালিসপুরার রাস্তা গিয়াছে। গোবর্দ্ধন দ্রুতপদে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বড় গলিপথে খালিসপুরায় একখানি বড়-সড় ত্রিতল বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সজোরে কড়া নাড়িতে লাগিল। সদর-দরজার ছিটকিনির সূতায় ত্রিতলের বারান্দা হইতে টান পড়িল, দরজা খুলিয়া গেল; উপর হইতে প্রশ্ন হইল,—"কে?"

গোবর্দ্ধন সোল্লাসে বলিয়া উঠিল,—"আমি গোবর্দ্ধন,—তর্করত্ন মশাই! নমস্কার; খবর আছে, নেমে আসুন একবার।"

সিঁড়িতে খড়ম বাজিয়া উঠিল; তর্করত্ন মহাশয় সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি সংবাদ?"

গোবৰ্দ্ধন বলিল,—"ঘর চাই ; ভদ্র ভাড়াটে, বেশী দিন থাকবে, পাঁচটি মাত্র প্রাণী ; কর্ত্তা, গিন্নী, মেয়ে, রাঁধুনী আর চাকর ; কিন্তু পূরো একটা তালা ছেড়ে দিতে হবে,—তেতালা হলেই ভাল হয়, দিতে পার্‌বেন ?"

তর্করত্ন মহাশয় সমস্ত মুখখানি রীতিমত সঙ্কুচিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিলেন, তাহার পর খুব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে উত্তর দিলেন,—"সকাল থেকে এই শুন্‌তে শুন্‌তে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল। সবাই বলে—ঘর চাই ; আরে বাপু, আর পাই কোথায় ? একতালা, দোতালা সব ভ'রে গেছে, নিজেদের ঘরগুলো পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়েছে, গিন্নী ছেলেপুলে আর রান্নাবান্না নিয়ে দোতালার বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছেন ; বৈঠকখানা থেকে দু'কেতা ভাড়া তোলবার ব্যবস্থা করেছি, তক্তোপোষের পায়ার নীচে তিনখানা ক'রে ইট দিয়ে উঁচু ক'রে দিয়েছি—তক্তার উপরেও একদল জায়গা পাবে, আর তার নীচেও কম পয়সায় থাকা চলবে—বুঝেছ ভায়া ?"

গোবৰ্দ্ধন হাসিয়া বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ, তা বুঝিছি ; এখন আমার সম্বন্ধে আপনি কি বুঝলেন, তা বলুন ; আমার যাত্রীরা নৌকায় বসে আছে।"

তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, "বটে ! তা পূরো তেতালাটা খালি ছিল, আর এখনও যে নেই, তা নয় ;—কিন্তু আজই একটু আগে এক জনকে কথা দিয়েছি, পাকা কথাই হয়ে গেছে—ভাড়া দিন দেড় টাকা !"

গোবৰ্দ্ধন প্রশ্ন করিল,—"টাকা তারা জমা দিয়ে গেছে ?"

তর্করত্ন বলিলেন,—"জমা না দিলেও কথাটা পাকা হয়ে গেছে ; ও-বেলা টাকা দেবে। তবে তুমি যদি রোজ দু'টাকা দেওয়াতে পার, তা হ'লে বিবেচনা কর্‌তে পারি ; কিন্তু তাদের অন্ততঃ পনের দিন থাক্‌তে হবে, আর টাকাটা আগুড়ি দেওয়া চাই।"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"তাই হবে, কিন্তু আমারও একটা কথা আছে।"

তর্করত্ন বলিলেন,—"তোমার আর এর মধ্যে কোন কথা থাকতে পারে না,—তুমি এর ওপর যা পার, ক'রে নিও।"

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল,—"সেই কথাই আপনাকে বল্‌ছি। শুনুন, আপনি রোজ তিন টাকা হিসাবে ভাড়ার কথা বলবেন, দু'টাকা আপনার, একটাকা আমার!"

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন,—"অ্যাঁ! আমার বাড়ী, আমি তার ভাড়া পাব দু' টাকা, আর তুমি তার দালালী নেবে এক টাকা! এ বড় অন্যায়!

গোবর্দ্ধন জবাব দিল,—"তা ত বটেই! বেশ, অন্য বাড়ী আমি দেখছি; এ ভাড়ায় অনেকে সেধে বাড়ী দেবে।"

তর্করত্ন মহাশয় বিচলিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"আহা-হা, চট কেন ভায়া? আমি কি বাড়ী দিতে নারাজ? একবারে মূলো-তোলা ক'রে খেতে নেই, বুঝে-সুঝে হিসেব ক'রে খেতে হয়,—এই কথাই না বলেছি!"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"কথা এখানে তোলাই ভুল, তর্করত্ন মশাই!"

কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, "তা বটে! আচ্ছা ভায়া —যাও, তোমার মক্কেলদের নিয়ে এস, আমি ততক্ষণ ঘরগুলো সাফ করাবার ব্যবস্থা করি, সাফাই খরচটা কিন্তু পাওয়া চাই ভায়া,—সেটা আধা-আধি বখরা, বুঝলে!"

"তাতে আটকাবে না" বলিয়া গোবর্দ্ধন চলিয়া গেল।

৫

তর্করত্ন মহাশয়ের বাড়ীর ত্রিতলে রাজীবলোচন মণ্ডল সপরিবার আশ্রয় লইয়াছেন। তিনখানি ছোট ছোট কামরা, তাঁহারা ট্রেণের যে কামরা রিজার্ভ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই বড় নহে। দুই দিক্ বন্ধ, দুই দিক্ খোলা, ছাদের এক পার্শ্বে টীনের ছাদ দেওয়া ক্ষুদ্র রন্ধনাগার, তাহারই এক ধারে টীনের দেওয়াল দিয়া আড়াল করা ভাঁড়ার, —আর এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র কলঘর, স্নানের ঘর ও পায়খানা। পনেরো দিনের অগ্রিম ভাড়া পয়তাল্লিশ টাকা এবং সাফাই খরচা তিন টাকা, মোট আটচল্লিশ টাকা দাখিল করিয়া তবে মণ্ডল মহাশয় গৃহ-প্রবেশের অধিকার পাইয়াছেন।

কয় দিনের নিত্য যাতায়াতে ও মেলামেশায় গোবর্দ্ধন এই পরিবারের অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার যত্ন ও সর্ব্ববিষয়ে নিখুঁত দৃষ্টি, উপযাচক হইয়া প্রত্যেক প্রয়োজনীয় জিনিস কিনিয়া আনিয়া দিবার আগ্রহ ও সকলেরই সহিত তাহার আন্তরিকতা এই নবাগত প্রবাসী পরিবারকে মুগ্ধ করিয়াছে। ইতোমধ্যেই সে সকলেরই সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়া লইয়াছে। আশৈশব গোবর্দ্ধন পিতৃমাতৃহীন, আপনার বলিতে তাহার কেহ নাই; তাই পিতৃতুল্য রাজীবলোচনকে সে এখন বাবা বলিয়া সম্ভাষণ করে, সেই সূত্রে গৃহিণী তাহার মা হইবেন, এ কথা বলাই বাহুল্য; গৃহিণীর আশ্রিতা স্বজাতীয়া পাচিকা হইয়াছে তাহার দিদি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই, তরুণী সুন্দরী শিখার সঙ্গে সে বাছিয়া বাছিয়া সম্পর্ক পাতাইয়াছে—বৌদি!

গৃহিণীকে গোবর্দ্ধন বুঝাইয়াছে যে, তাঁহার জামাতা যে তাহারই সেই দাদা, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কাযেই শিখাকে সে বৌদি বলিয়াই ডাকিবে।

শিখারও চিত্তে প্রথমতঃ যে সঙ্কোচ ছিল, গোবর্দ্ধনের ব্যবহারে তাহা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইল। গোবর্দ্ধনের কথা কহিবার কৌশলপূর্ণ বিচিত্র ধারা, কাশীর লাইব্রেরীসমূহ হইতে উপযাচকভাবে গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া যোগান দেওয়া এবং সর্ব্বোপরি তাহার প্রতিবাদহীন কোমল বিনম্র ব্যবহার শিখাকে তাহার প্রতি আকৃষ্টও করিয়াছে।

প্রয়োজন না থাকিলেও গোবর্দ্ধন অনেক সময় মণ্ডল মহাশয়ের বাসায় হাজির থাকিত। গল্প-গুজবে, কাশীর কথায় শিখার সহিত তাঁহার আলাপ ভালই জমিত, কিন্তু যখনই শিখা এই আলাপের ভিতর দিয়া সাহিত্যের ভাণ্ডার খুলিয়া বসিত, তখন এহেন বিচক্ষণ বাক্‌পটু গোবর্দ্ধনকে একবারে বেকুব হইতে হইত। তখনই নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্য তাহার স্মরণপথে উদিত হইয়া তাহাকে অভিভূতের মত অন্যত্র টানিয়া লইয়া যাইত। কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিতা বিদুষী শিখা গোবর্দ্ধনের শিক্ষাদীক্ষার দৌড় কতদূর এবং কোথায় তাহার দুর্ব্বলতা, তাহা বেশ বুঝিয়া লইয়াছিল। সেই জন্য যখনই গোবর্দ্ধনের উপস্থিতির দীর্ঘতা বা আন্তরিকতার বাড়াবাড়ি তাহার পক্ষে বিরক্তিকর বোধ হইত, তখনই সে আলোচ্য বিষয়ের মোড় ঘুরাইয়া তাহাকে উচ্চসাহিত্যের এমন প্রস্তরবদ্ধ পথে লইয়া তুলিত যে, বেচারা গোবর্দ্ধন তখন কার্য্যের অছিলায় পলাইবার পথ পাইত না।

গোবর্দ্ধন মনে করিয়াছিল, সে এই স্বামিপরিত্যক্তা সুন্দরী কৈবর্ত্ত-যুবতীর হৃদয়-দুর্গ তাহার স্বভাবসিদ্ধ বাক্‌চাতুর্য্যের সাহায্যে সহজেই জয় করিয়া লইবে। শিখার শিক্ষার কথা রাজীবলোচনের মুখে শুনিয়া সে

মনে করিয়াছিল, সাধারণ লেখাপড়াজানা মেয়েদের মত এই মেয়েটীরও শিক্ষার দৌড় রামায়ণ-মহাভারত বা বড় জোর সোজা সোজা নাটক-নভেল পড়িবার দক্ষতা পর্য্যন্ত; কিন্তু আলাপসূত্রে যখন এই তরুণী সেলি, সেক্সপীয়ার, টেনিসনের লেখা লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিত, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ-চরিত্র ও রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার প্রসঙ্গ তুলিত, তখন গোবর্দ্ধন বেশ বুঝিয়া লইল যে, এ হাটে বেসাতি করিতে আসা তাহার পক্ষে নিতান্ত ঝক্‌মারীর কায হইয়াছে।

শিখার পিতা রাজীবলোচন যদিও ইদানীং সহরের সংস্পর্শে আসিয়া সহরের রীতিনীতির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি আবাল্যের সংস্কারসঙ্কুল সনাতন বিধি-ব্যবস্থাগুলির অধিকাংশই মানিয়া চলিতেন। সহরে থাকিয়াও সহরের আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট কৃত্রিমতা ও আভিজাত্যের স্পর্দ্ধার সহিত পরিচিত হইবার অবকাশ তিনি পান নাই। তিনি যাহাকে দেখিতে পারিতেন না, কদাচ তাহার সংস্পর্শে যাইতেন না; কিন্তু যাহার সহিত খাপ খাইত, তিনি প্রাণ খুলিয়া তাহার সহিত মিশিতেন, মনের কোনও প্রান্তে তাহার সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ পোষণ করিতেন না। তাঁহার চরিত্রের আর একটা বিশেষত্ব ছিল, উপকারকের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা। কোনও প্রকারে উপকারককে সাহায্য করিবার অবকাশ পাইলে তিনি আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। এই সরল, উদার, মহানুভব মানুষটির প্রকৃতিগত মহত্ত্ব বা দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া তাঁহাকে উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে, কাশীর এই কৃতিমান্ ভদ্রবেশী 'ভাম্পায়ার', সুচতুর গোবর্দ্ধনকে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় নাই।

গৃহিণীর প্রকৃতিও স্বামীর প্রকৃতির প্রতিবিম্বস্বরূপ ছিল। তিনি

কাহাকেও কখনও উঁচু কথাটি পর্য্যন্ত কহিতে পারিতেন না। কাহাকেও তিনি সন্দেহ করিতেও জানিতেন না,—নিঃসম্পর্কীয়, পথে পরিচিত যুবাকে তাঁহার বিবাহিতা যুবতী কন্যার সহিত অবাধে অসঙ্কোচে মেলা-মেশা করিতে দেখিয়াও তিনি মনে কিছুমাত্র সংশয় পোষণ করেন নাই। তাঁহার মেয়ে যে কখনও খারাপ হইতে পারে, আর গোবর্দ্ধনের মত এমন পরোপকারী ব্রাহ্মণ-সন্তান যে তাঁহাদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারে, এ কল্পনাকেও তিনি মনের মধ্যে আমোল দিতে পারেন নাই।

কিন্তু শিখার প্রকৃতি ছিল পিতা-মাতার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। শিক্ষার প্রভাবে অথবা কলেজের বিভিন্ন সমাজের শিক্ষিতা মেয়েদের সংস্পর্শে আসার ফলে সে পিতামাতার প্রকৃতিগত মহত্বকে তাঁহাদের মনের দুর্ব্বলতা ভাবিয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইত। গোবর্দ্ধনের প্রতিকার্য্যে নিঃস্বার্থ পরোপকার-স্পৃহা দেখিতে পাইলেও, শিখা কিন্তু তাহার অযাচিতভাবে এই সকল ফাইফরমাজ খাটা ও ব্যাপকভাবে সর্ব্বদা তাহাদের সাংসারিক সকল কার্য্যের সংস্পর্শে থাকার মধ্যে পরার্থপরতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম হইত ; তাহার রূপের শিখা ও তাহার পিতার অর্থের প্রভাব যে গোবর্দ্ধনকে একান্ত অভিভূত করিয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখার বিলম্ব হয় নাই। তথাচ এই অশিক্ষিতপটু যুবকটির ভাবভঙ্গী, ভব্যতা-জনক চালচলন, সুশিক্ষিতের মত সুসঙ্গত কথাবার্ত্তা শিখার সন্দিগ্ধ অন্তরকেও তাহার পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছিল।

এক দিন শিখা কৌতূহলবশে কথায় কথায় গোবর্দ্ধনকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি ত নিজেই স্বীকার করেছ, কখনও স্কুলে বই নিয়ে বস নি, ইংরিজী অক্ষরও তুমি চেন না ; কিন্তু তোমার কথা

শুনে মনে হয়—তুমি যেন সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছ। এ সব কথা শিখেছ কোথায় শুনি ?”

গোবৰ্দ্ধন কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বেশ সরল ও খোলাখুলিভাবে বলিল,—“বিদ্যে আমার শুধু তোমার কাছেই ধরা প’ড়ে গেছে, বৌদি! নতুবা এ পর্য্যন্ত কেউ আমার এত বড় চালাকী ধর্‌তে পারে নি। ছেলেবেলা থেকে মা-বাপ-হারা, স্কুলে পড়াবে কে বল? ছেলে-বয়েসেই সখের থিয়েটারের আখড়ায় ঢুকলুম। সেটা আখড়া হ’লেও ছিল অনেকটা স্কুলের মত; পার্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টারের চেষ্টায় বর্ণপরিচয় থেকে আরম্ভ ক’রে পার্ট পড়বার বিদ্যে পর্য্যন্ত লাভ করা গেল। আর এই সূত্রেই অনেক লেখাপড়া-জানা লোকের সংস্রবে এসে কথার মারপ্যাঁচ আর লোক বুঝে কথা বলবার ধারাটা আয়ত্ত ক’রে নেওয়া গেছে।”

হাসিয়া শিখা বলিল,—“বটে, তাই বল, থিয়েটারের ফেরত তুমি! দেখ, একবার আমাদের কলেজে চাটগাঁর ফ্লডে সাহায্য করবার জন্যে আমরা থিয়েটার করি। তার রিহারসেলের সময় ষ্টার থিয়েটারের এক জন নামজাদা অ্যাক্টরকে আনা হয় মোসন শেখাবার জন্যে—যেমন তাঁর চেহারার পারিপাট্য, তেমনই কেতাদুরস্ত চাল, রোজই তিনি একখানা কেতাব হাতে ক’রে আস্‌তেন। বাঙ্গালা কেতাব নয়, ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ, জার্ম্মাণ, রাসিয়ান অথারদের নামজাদা বই; আমরা দেখে অবাক্ হয়ে ভাবতুম—না জানি কত বড় পণ্ডিত! শেষে এক দিন হঠাৎ একটা সামান্য কথায় তাঁর বিদ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন জানা গেল, তিনি মোটেই ইংরিজী জানেন না! তখন আমাদের কি হাসির ধূম! তিনি আর সে-মুখো হন নি।”

বিজ্ঞের মত গোবর্দ্ধন বলিল,—"এই জন্যেই বিবেকানন্দ ব'লে গেছেন—চালাকীর দ্বারা কোন কায করা যায় না!"

শিখা একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল,—"অমন কথা ব'ল না, ঠাকুরপো। কথাটা যে তোমাকেই রীতিমত আঘাত দিলে!"

গোবর্দ্ধন নির্ব্বাক্ নয়নে শিখার চপল হাস্যময় মুখখানির দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল।

৬

সে দিন আর আলাপ ভাল জমিল না। সন্ধ্যার একটু আগে বিদায় লইয়া গোবর্দ্ধন বাসায় ফিরিয়া আসিল। খালিসপুরার বড় রাস্তার মাঝামাঝি অংশ হইতে একটি সরু গলি বাহির হইয়াছে; গলিটি কুকুর-গলি নামে বিদিত। এই গলির ভিতর একখানি জীর্ণ একতালা বাড়ী। গোবর্দ্ধন পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সম্বৎসরের মধ্যে কোনও ঋতুতেই বোধ হয় এ স্থানে সূর্য্যদেব দৃষ্টি দিবার ফুরসৎ পান না।

অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি ঘরের মধ্যে গোবর্দ্ধন প্রবেশ করিল। তাহার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে করিতেও দ্বিধা হয় যে, এই অপরিচ্ছন্ন জঘন্য গৃহের সে অধিবাসী। দেওয়ালের এক দিকে দ্বারপার্শ্বে একটি লোহার হুকে বহু দিনের পুরাতন টীনের এক দেয়াল-লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, দেয়াশলাই বাহির করিয়া গোবর্দ্ধন তাহা জ্বালিয়া দিয়া গৃহমধ্যস্থ খাটিয়ায় বসিয়া পড়িল।

সারা পথই আজ সে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, শিখার কথাটার অর্থ কি? কি মনে করিয়া এ কথা সে বলিল?

গোবর্দ্ধন 'বসিয়া' বসিয়া ভাবিতে লাগিল; শিখার সহিত পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সকল কথা, সকল আচরণ একে একে মনের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বিশ্লেষণ করিতে লাগিল। প্রায় পনের মিনিট চিন্তার পর সে আপন মনে বলিয়া উঠিল "না, না, এ তার পরিহাস! আমাকে মূর্খ দেখে সে আমাকে নিয়ে কৌতুক করে মাত্র! কৈবর্ত্তের

মেয়ে লেখাপড়ার দেমাকে আমাকে—আচ্ছা, আমি তাকে একবার ভাল ক'রে দেখে নেব। শিখাকে আমি না পেতে পারি, কিন্তু—"

সহসা কি এক সয়তানী চক্রান্ত তাহার মস্তিষ্কের ভিতর আলোড়িত হইয়া তাহাকে প্রমত্ত করিয়া তুলিল। আকস্মিক উল্লাসে গোবর্দ্ধন সবেগে উঠিয়া পড়িল। তাহার মূর্ত্তি তখন অন্যরূপ! সুপরিচ্ছদধারী এই সৌখীন যুবকটির আবাসভূমির অপরিচ্ছন্নতার মত, তাহার সুন্দর মুখখানির উপর মনের কদর্য্যতা পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হইয়া তাহাকে প্রেতের মত ভয়াবহ দেখাইতেছিল।

ক্ষিপ্রহস্তে আলো নিবাইয়া, দরজা বন্ধ করিয়া গোবর্দ্ধন বাহির হইয়া পড়িল।

৭

শঙ্করলাল কাশীর কোনও বিখ্যাত পাণ্ডার প্রধান শিষ্য, পালকপুত্র ও উত্তরাধিকারী। তাহার বয়স বাইশ তেইশ বৎসর—অসাধারণ লম্বা-চওড়া সুন্দর যুবা পুরুষ। পাণ্ডামহলে তাহার ন্যায় সুপুরুষ সচরাচর দেখা যায় না। পাণ্ডাজী তাহার প্রতি একান্ত স্নেহপরবশ হইয়া তাহাকে শুধু মন্দিরের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া স্বতন্ত্র শিক্ষক রাখিয়া তিনি তাহার শিক্ষার ব্যবস্থাও কতকটা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সংস্পর্শে তাঁহাকে প্রায়ই আসিতে হয় বলিয়া তিনি শিষ্যকে বাঙ্গালী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাঙ্গালা ভাষাও শিখাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ফলে শঙ্করলাল বাঙ্গালা ভাষাও শিখিয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপন্ন এই নবীন যুবকের মনের খোরাক যোগাইবার জন্য তাহার নর্ম্ম-সহচর বা স্তাবকদল দশাশ্বমেধঘাট হইতে বাছিয়া বাছিয়া ছবিওয়ালা বটতলার প্রেমোদ্দীপক কেতাবগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিত, পরন্তু সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া নবীন যুবার মনে এই ধারণাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, বাঙ্গালীই প্রেমের মর্য্যাদা বুঝে, তাই তাহারা এমন কেতাব লিখিতে পারে। কালক্রমে পাণ্ডার শিষ্যের এই বাঙ্গালীপ্রীতি প্রেমলালসার মধ্য দিয়া তাহার বাঙ্গালী নর্ম্ম-সহচরদের সহায়তায় এমন কদর্য্যপথে বহিয়া চলিল যে, তাহার পরিণাম পরে ভীষণ হইয়া উঠিল।

পাণ্ডাজী দিবারাত্রিই দেব-সেবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকিতেন; নিজের সাধনভজনও সময়মত করিতেন। পুত্রতুল্য শিষ্য পাণ্ডাজীর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া দিবাভাগে প্রহরখানেকমাত্র দেবায়তনে থাকিয়া তাহার পর

নিজের খাসকামরায় আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত। এইখানে বসিয়া সে তাহার বিলাসজীবনের একমাত্র কাম্য, তাহার আরাধ্য রূপসীদের রূপ চিন্তা করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। সুন্দরী-সংগ্রহের জন্য এই দুর্ব্বৃত্তের অনেকগুলি পোষা দালাল ছিল। তাহারা স্বভাবসিদ্ধ চাতুরীর প্রভাবে কল্পিত সুন্দরীর প্রসঙ্গ তুলিয়া এই বিষয়-বুদ্ধিহীন অর্ব্বাচীন যুবককে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া পাকে-চক্রে তাহার নিকট হইতে প্রভূত অর্থ শোষণ করিত। ভদ্র ঘরের মহিলারাই এই পাপিষ্ঠের আকাঙ্ক্ষার পাত্রী ছিল এবং এই দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য সে টাকা ছড়াইতে দৃক্‌পাত করিত না; তাহার অনুগৃহীত দালালরাও এই সূত্রে কাশীর ডালমুণ্ডির বারবনিতাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আশাতীত অর্থ উপার্জ্জন করিত এবং শঙ্করলালও এইভাবে দুধের সাধ ঘোলে মিটাইয়া ক্রমশঃই স্পর্দ্ধিত ও প্রলুব্ধ হইতেছিল।

গোবর্দ্ধন ছিল এ সব বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণ সুদক্ষ ওস্তাদ। সময়ে অসময়ে শঙ্করলালের লালসার অনলে ইন্ধন যোগাইয়া সে তাহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। শঙ্করলালের খাস মজলিসে গোবর্দ্ধনের খাতিরও সামান্য ছিল না। কিন্তু সে রাত্রিতে গোবর্দ্ধন যখন বাসা হইতে বাহির হইয়া বরাবর শঙ্করলালের খাস কামরায় ঢুকিয়া সিদ্ধিপানের মৌজে রত প্রভুর উদ্দেশে সহাস্যে রাম রাম করিয়াও বিনিময়ে কোনও প্রকার সম্ভাষণ বা আহ্বান পাইল না; বরং শঙ্করলাল তাহাকে দেখিবামাত্র সিদ্ধিপাত্রটি মুখ হইতে ঈষৎ নামাইয়া বিকট দন্তবিকৃতি ও ভ্রূকুটি করিয়া সহসা গম্ভীর হইয়া পড়িল, তখন গোবর্দ্ধন একটা প্রমাদ কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিল। তত্রাচ সে দমিল না এবং দমিবার পাত্রও সে নহে; কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া লইয়া বেশ স্বচ্ছন্দ-

ভাবে ফরাসের উপর বসিয়া পড়িয়া সে বলিল,—"বাবুজীর আজ হয়েছে কি ?"

বাবুজী গোবর্দ্ধনের মুখের দিকে একবার চাহিয়া পরক্ষণে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বেশ সহজভাবেই উত্তর দিল,—"আর হবে কি ? তোমার বেইমানী ধাপ্পাবাজী চালাকী আজ ধরা প'ড়ে গেছে !"

গোবর্দ্ধনের বুক কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু মুখ শুকাইল না, মুখের উপর কুটিল হাসি টানিয়া আনিয়া সে বলিল,—"তাই না কি ? তা ব্যাপারখানা কি, শুনি ?"

শঙ্করলাল বলিল,—"তুমি যে মস্ত বড় পাজী, সেটা জানা কথা। কিন্তু তার চেয়েও বড় মিথ্যেবাদী যে তুমি, তা আমি জানতুম না।"

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া গোবর্দ্ধন অম্লানবদনে শঙ্করলালের মুখের উপর বলিল,—"হাঃ হাঃ ! বাবুসাহেব বুঝি এত দিন জেনে এসেছেন যে, পাজীরা সবাই সত্যবাদী ! এ ভুল ত এক দিন ভেঙ্গে যেতই ; বাবুজীর এর আগেই জানা উচিত ছিল, মিথ্যের মদৎ না নিয়ে পেজোমী কখনও পয়দা হ'তে পারে না।"

গোবর্দ্ধনের কথার ধারায় শঙ্করলালের অপ্রসন্ন মন কতকটা তাজা হইলেও ভিতরের প্রচ্ছন্ন জ্বালা তখনও তাহাকে পীড়া দিতেছিল। সে এবার ভূমিকা ত্যাগ করিয়া সহসা বলিয়া উঠিল,—"তোমার মত ভণ্ড বেহায়া আমি দুটো দেখিনি ; সে দিন তুমি গেরস্তির বৌ ব'লে যে মাগীটাকে এনে দিয়ে মবলগ দুশো টাকা নিয়ে গেলে, সে হারামজাদী কুণ্ডিটোলার তিন পুরুষে সতী !"

মুখ শুকাইয়া আসিলেও দক্ষ অভিনেতার মত গোবর্দ্ধন সাধ্য কৌশলে অবসন্ন মনকে সবলে তাজা করিয়া মুখের উপর কৌতূহলের উচ্ছ্বাস

টানিয়া আনিয়া বলিয়া উঠিল,—"সত্যি না কি? সে বেটী কোথায় বলুন ত?"

মুখ বিকৃত করিয়া শঙ্করলাল বলিল,—"আর ন্যেকা সেজে কায নেই। টাকার বখরা নিয়ে ঝগড়া হওয়ায় সে নিজেই আমার কাছে এসে সমস্ত ব'লে দিয়ে গেছে। এমনই ক'রে তোমরা আমাকে বেকুব বানিয়ে এসেছ? ছি! আর আমি তোমাদের ফাঁদে পা দিচ্ছি না। এ সব নোংরা কাযে আর যাবও না।"

বক্রদৃষ্টিতে গোবর্দ্ধন একবার এই বৈরাগ্যপরায়ণ সাধু পুরুষটির দিকে তাকাইয়া আবেগভরা গাঢ়স্বরে বলিতে লাগিল,—"বাবুজী হচ্ছেন রইস-আমীর; বাড়ীতে ব'সে পয়সার জোরে মনের সাধ মেটান; আমরা গরীব পরোয়া, বাবুজীর এই সাধের চীজ জোগাড় করতে তামাম সহর ছুটোছুটি করি। কোথায় মোগলসরাই, কোথায় সিক্রোল, কোথায় নাগোয়া,—দিন-রাত ঘুরে মরি। কত যায়গায় ঠেঙ্গানি খাই, গালাগালি খাই—তার নিরিখ নেই। আর কাশীর এঁরাও আজকাল পাল-পার্ব্বণে ঘাটে-পথে বেরুতে আরম্ভ করেছেন, দেখলেই মনে হয় ভদ্রঘরের মেয়ে। কাযেই আমাদেরও এতে ধোঁকায় পড়া বা ভুল হওয়া বিচিত্র নয়! তাছাড়া আপনি যার কথা তুলেছেন, তার স্বরূপ আমিও ক'দিন হ'ল জানতে পেরেছি; কিন্তু তার সঙ্গে যোগ-সাজস ক'রে তাকে এনেছি, এ মিথ্যে কথা; ইচ্ছা হয়, তাকে আনিয়ে প্রমাণ করুন, আমি এতে পেছপাও নই; কিন্তু এ সব ব্যাপার নিয়ে হাঙ্গামা করতে গেলে, হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙ্গে যাবে, এটা যেন বাবুজীর মনে থাকে।"

শঙ্করলাল নিরুত্তর রহিল। চতুর গোবর্দ্ধন বুঝিয়া লইল—তাহার বক্তৃতা ব্যর্থ হয় নাই।

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া এইবার গোবর্দ্ধন তাহার ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিল। সে বলিল,—"সত্যই কাযটা বড়ই নোংরা হয়ে গেছে। ভদ্র ঘরের মেয়েদের ওপর যে আপনার অনুরাগ, তা কি আমি না জানি? আমারই ভুলের দোষে যা হয়েছে, এবার তা শোধ ক'রে দেব। এ ক'দিন কি আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম মনে করেন? জানেন ত শিবরাত্রির মরসুম পড়েছে। আজ ক'দিন হ'ল ভাগ্যক্রমে হঠাৎ এক বড়ঘরের মেয়ে আমার হাতে এসে পড়েছে। বাবুজী অনেক রূপ দেখেছেন, কিন্তু এমনটি এ পর্য্যন্ত দেখেন নি—এ আমি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি।"

বাবুজীর মনের ভিতরের সমস্ত গোলমাল ও অপ্রসন্নতার অন্ধকার এই মুখরোচক সংবাদটির উচ্ছ্বাসে মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কৌতূহল-বিকসিতমুখে জিজ্ঞাসুনয়নে সে গোবর্দ্ধনের দিকে চাহিল।

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল,—"বয়েস আঠার উনিশ। খাস কলকেতার মেয়ে, লেখাপড়া-জানা, কালেজে পড়া, পাশ করা—"

শঙ্করলালের ধৈর্য্যের বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল। সহর্ষে সে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাগাতে পেরেছ তাকে? সে কি চায়?"

গোবর্দ্ধন অসম্ভবরূপ গম্ভীর হইয়া বলিল,—"সে কিছু চায় না, তার বড় একটা অভাবও নেই, কিন্তু তার সঙ্গে যারা থাকে, তাদের হাত করতে আর মুখ বন্ধ করতে হাজারখানেক ছাড়তে হবে। এর মধ্যেই আমার শ আড়াই গ'লে গেছে। কিন্তু এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই;—এমনটি আর মিলবে না; সাদি হলেও তার স্বামী নেই,—নিরুদ্দেশ; কাযেই হাঙ্গামারও কোন ভয় নেই।"

অস্থিরভাবে শঙ্করলাল পশ্চাদ্ভাগে রক্ষিত প্রকাণ্ড তাকিয়াটির উপর উঠিয়া বসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে গোবর্দ্ধনকে বলিল,—"হাজার টাকা

লাগে, তাই দেব আমি; তুমি নিয়ে এস তাকে; আজই—এই রাত্রেই!"

ধীরে ধীরে বিজ্ঞের মত গোবর্দ্ধন বলিল,—"অত ব্যস্ত হ'লে হবে না, বাবুজী।—যে সে ঘরের মেয়ে নয় সে। খুব কায়দা ক'রে আনতে হবে।"

"তা হ'লে কবে আনছ শুনি?"

গোবর্দ্ধন একটু চিন্তা করিয়া উত্তর দিল,—"সে কথা কাল এই সময় আপনাকে জানাব। তবে বেশী দেরী হবে না, শিবরাত্রির মধ্যেই কায হাসিল ক'রে দেব। কিন্তু তার আগে শ তিনেক টাকা আমাকে আগুড়ি দিতে হবে।"

শঙ্করলাল বলিল,—"তাতে আটকাবে না, কাল এসে নিয়ে যেও। কিন্তু মনে রেখো—এও যেন কুণ্ডিটোলার আমদানী না হয়,—তা হ'লে কিন্তু এবার তোমার নিস্তার থাকবে না।"

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল,—"বাবুজী তাকে দেখলেই বুঝবেন, সে কোথাকার আমদানী,—কলকেতার কলেজ থেকে পাশ করা—"

তাম্বুলপূর্ণ রূপার সুবৃহৎ ডিপাটি শঙ্করলাল গোবর্দ্ধনের হাতের নিকট বাড়াইয়া দিল। গোবর্দ্ধন সসম্ভ্রমে কয়েক খিলি পাণ তুলিয়া লইয়া বাবুজীকে অভিবাদন জানাইয়া চলিয়া গেল!

৮

কাশীতে আসিয়া অবধি নিত্য গঙ্গাস্নান ও দেব-দেবী-দর্শন রাজীব-লোচন ও তাঁহার গৃহিণীর নিত্য কর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছিল। পাচিকা ও ভৃত্যটিও সময় সময় ইঁহাদের সঙ্গে যাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। প্রথম প্রথম গোবর্দ্ধনই ইঁহাদের পাণ্ডাস্থানীয় হইয়া সকল কাযকর্ম্ম ও দর্শনাদি করাইত। ইদানীং তাহার সাহায্যের প্রয়োজন হইত না। গোবর্দ্ধনকে প্রত্যহ কষ্ট দিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন। গোবর্দ্ধনও ইহাদিগকে পরিহার করিয়া নির্জ্জনে শিখার সহিত দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ খুঁজিত। কিন্তু শিখাকে ঠিক এই সময় গৃহস্থালীর কার্য্যে রন্ধনশালায় এত ব্যস্ত দেখা যাইত যে, অধিকাংশ দিনই গোবর্দ্ধনকে নিরাশ হইয়া নিতান্ত অপ্রসন্ন মনে বাসায় ফিরিতে হইত।

গৃহিণী অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও তাঁহার এই খেয়ালী মেয়েটিকে এক দিনের জন্যও কোনও মন্দিরে লইয়া যাইতে পারেন নাই। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে শিখা মায়ের মুখের উপর বলিত,—"আগে আমার দেবতাটিকে খুঁজে এনে দাও, তার পর খুব ধূমধাম ক'রে তোমাদের দেবতার পূজো দিতে যাব ; কিন্তু তার আগে নয়।"

মেয়ের কথায় গৃহিণী অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না ; কর্ত্তার নিকট গিয়া মেয়ের কথা বলিতেন। পিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গদ্গদস্বরে উত্তর দিতেন,—"এতে দুঃখ কর না গিন্নি, দেবতা এতে রুষ্ট হবেন না, বরং শিখার এ সাধনায় তুষ্ট হয়ে তার দেবতাকে মিলিয়ে দেবেন, দেখো।"

শিখার স্বামী অরিন্দম রূপে, গুণে, চরিত্রে, শিক্ষায় শিখার মনের মত

হইলেও, একটি বিষয়ে শিখা স্বামীর সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে মিলিতে পারে নাই এবং মিলনের এই অন্তরায়টি তাহার স্বামী ও পিতা-মাতার নিকট সৌভাগ্য ও আনন্দদায়ক হইলেও শিখার মনে তাহা নিতান্ত অবমাননা-কর বলিয়া পীড়া দিত। সেটি—স্বামীর স্বাবলম্বনের অভাব বা পরনির্ভরতা। আশৈশব মাতুলালয়ে প্রতিপালিত এই দরিদ্র যুবকটির কুলশীল, প্রকৃতি ও বিদ্যার পরিচয় পাইয়া দূরদর্শী রাজীবলোচন তাঁহার একমাত্র সন্তান গুণবতী শিখার উপযুক্ত মনে করিয়া তাহাকে জামাতা নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। বিবাহের পর অরিন্দম শ্বশুরালয়েই অবস্থান করিয়া শ্বশুর মহাশয়ের বিষয়-সম্পত্তি পরিদর্শনে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শিখা তাহার জীবনের কাম্য দেবতাস্থানীয় চরিত্রবান্ শিক্ষিত স্বামীকে পিতার অন্নদাস হইতে দেখিয়া লজ্জায় ঘৃণায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর দারিদ্র্য তরুণীকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। কিন্তু তাহার আত্মনির্ভরতার দৈন্য শিখাকে পীড়া দিত। স্বামীর সহিত সে পর্ণকুটীর আশ্রয় করিলেও পরিতৃপ্ত হইতে পারিত, কিন্তু স্বামিসহ পিতার অগাধ ঐশ্বর্য্যমধ্যেও প্রতিষ্ঠিত হইয়া সে পরিতুষ্ট হইতে পারে নাই। আত্মীয়-স্বজন যখন তাহার আরাধ্য স্বামীর এই হীনতার সুযোগে তাহার ধনাঢ্য পিতার উদারতার প্রসঙ্গ তুলিত, তখন শিখার সুন্দর মুখখানি লজ্জায় কালো হইয়া উঠিত, অনির্ব্বচনীয় বেদনায় বুকখানি টন্ টন্ করিত, সে মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিত।

অরিন্দম প্রাণ ভরিয়া শিখাকে ভালবাসিলেও, শিখার অন্তরের এই অতৃপ্তি কাঁটার মত তাহার মনে খোঁচা দিত এবং তরুণ দম্পতির এই মানসিক বৈষম্য তাহাদের মিলনকে পরিপূর্ণ ও সার্থক করিয়া তুলিতে পারিত না।

শিখা

শিখার আকাঙ্ক্ষা অরিন্দমের ন্যায় শিক্ষিত যুবার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই; কিন্তু সংসারের মধ্যে আপনার বলিয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইবার এক কাঠা ভূমি বা একখানি পর্ণকুটীরও যাহার নাই, সদ্য কলেজ হইতে বাহির হইয়া, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে যে ধনীর সংসারে আসিয়া পড়িয়াছে, স্বাধীনভাবে উপার্জ্জনের কোনও পন্থার সহিত যে এখনও পরিচিত হয় নাই,—সে কোন্ ভরসায় শিখার মত সুন্দরী শিক্ষিতা ধনি-কন্যাকে লইয়া সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবে?—অথচ স্বামী হইয়া, পুরুষ হইয়া যাহাতে তাহার ভয় ও সংশয়,—শিখার তাহাতেই স্পৃহা ও উৎসাহ পূর্ণমাত্রায়! অরিন্দম অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

ঠিক এই সময় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগের ভেরী গুরুগম্ভীর মন্দ্রে বাজিয়া উঠিল। কলেজের ছেলে, অফিসের কেরাণী, উকীল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী—কর্ত্তব্যের প্রেরণায় যেমন অবলম্বিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের পথে ছুটিয়া বাহির হইল,—তেমনই আর এক শ্রেণীর বুদ্ধিমান —যাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া জীবন-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ধুঁকিতেছিল, তাহারাও আত্মগোপন বা আত্মপ্রবঞ্চনার উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া ইহাকে উত্তম উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গুটাইয়া এই পথে বাহির হইয়া পড়িল।

অরিন্দমও উপায় অন্বেষণে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। আর বিচার করিবার অবসর না লইয়াই দেশমাতৃকার আদর্শ সন্তানরূপে দেশের আহ্বানে সে-ও নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইল।

অরিন্দমের দুই ছত্রের পত্র পড়িয়া বাড়ীর সকলে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেও, শিখা কিন্তু তাহাতে মনে মনে গৌরব অনুভব করিয়াছিল। অরিন্দমের বিচ্ছেদ-ব্যথা অপেক্ষা পরানুবর্ত্তিতা হইতে তাহার মুক্তির

আনন্দ এই স্বভাব-তেজস্বিনী তরুণীকে অধিকতর অভিভূত করিল। কিন্তু ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, অরিন্দমের কোনও সমাচার পাওয়া গেল না;—মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল,—বহু অসহযোগী জীবনের ভুল বুঝিয়া জীবনযাত্রার পথে আবার যখন ফিরিয়া আসিল,—তখনও অরিন্দমের কোনও সমাচার আসিল না,—তখন সকলের অপেক্ষা শিখার স্বামিপ্রেমপূর্ণ ক্ষুদ্র বুকখানি ভাঙিয়া পড়িল। সে যাতনা, তীব্র অনুশোচনা, সে একাই দিবারাত্রি অনুভব করিত।—অরিন্দমের অন্তর্দ্ধানের সূত্র সে ভিন্ন অন্য কেহই জানিত না। সকল কষ্ট —সকল দুর্ভাবনা অন্তরে তাহাকে একাই সহ্য করিতে হইত।

শিখা শুনিয়াছিল, কাশীতে আসিলে, কাশীনাথকে কায়মনঃপ্রাণে ডাকিলে মানুষের কামনা পূর্ণ হয়। তাই সে মনে মনে আশা পোষণ করিতেছে যে, তাহার কামনা কাশীতে অপূর্ণ থাকিবে না। মায়ের কাছে দেবদর্শন সম্বন্ধে সে বড়াই করিলেও, মায়ের অগোচরে মনে মনে বিশ্বনাথের উদ্দেশে সে বলিত,—"তুমি বিশ্বনাথ, শুধু একটা ক্ষুদ্র মন্দিরের নাথ নও, বিশ্বের মানুষের মনের মন্দিরেও তুমি; আমার মনের কথা তোমার অগোচর থাকতে পারে না, মনের মন্দির থেকেই তুমি আমার প্রার্থনা শোন—আমার মনের দেবতাকে মনের মত ক'রে দেখিয়ে দাও।"

সে দিন গোবর্দ্ধন আসিয়া বলিল,—"শুনেছ বউদি, কাশীতে এক জন আশ্চর্য্য সাধু এসেছেন।"

শিখা বলিল,—"কলকেতার লোক সাধুর কথা শুনলেই ভণ্ড ব'লে বসে; তাইতে আমাদের সাধু-দর্শনের সৌভাগ্য ঘ'টে উঠে না।"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"কাশীর লোকও আজকাল আর সাধু মানে না; তবে এ সাধু একটু অন্যরকমের; পয়সা-কড়ির ধার দিয়েও যায় না,

ভণ্ডামী মোটেই নেই, কিন্তু শক্তি সত্যিই আছে ; যে যা জিজ্ঞেসা করেছে —তাই ব'লে দিয়েছে, আর হুবহু মিলে গেছে।"

শিখা একটু আগ্রহের সহিত বলিল, "তা হ'লে আমাকে সেই সাধুর কাছে নিয়ে যাবে ঠাকুরপো ?"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"স্বচ্ছন্দে ; যে দিন যাবার ইচ্ছা হবে বলো, নিয়ে যাব। কিন্তু শিবরাত্রির পরই তিনি চ'লে যাবেন।"

শিখা বলিল,—"বেশ ত, তা হ'লে শিবরাত্রির দিনই নিয়ে চল না কেন!"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"সে ত ভাল কথাই, শিবরাত্রির দিন মন্দিরেই ভীড় হবে ভীষণ। সাধুর ওখানে সে দিন বড় একটা কেউ যাবে না। কথাবার্ত্তা বলবার সেই দিনই সুবিধার। তা হ'লে মা ও বাবাকে বলি?"

শিখা কি ভাবিল, পরক্ষণে' বলিল,—"না, না, তাঁদের এ কথা জানিয়ে কায নেই ; আমি একাই যাব। অনেক দিন থেকেই আমার সাধ, ভাল সাধু পেলে, দুচারটি কথা জিজ্ঞাসা ক'রে মনের সংশয় মেটাব। কিন্তু সে সুযোগ এ পর্য্যন্ত ঘ'টে ওঠে নি, দেখি এবার যদি তোমার প্রসাদে তা হয়ে যায়।"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"দাদার কথা শুনে অবধি আমার মনে শান্তি নেই ; —আমি যাঁকে কল্পনা ক'রে রেখেছি,—এখনও পর্য্যন্ত কাশীতে তাঁর আগমন হয় নি। এই সাধুর কথা শুনে অবধি আমার মনে একটা আগ্রহ হয়েছে,—তিনি যা বলেন, মিথ্যা হয় না ; এখন আমাদের অদৃষ্টক্রমে—"

এই সময় রাজীবলোচন সস্ত্রীক দেবদর্শনাদি করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। গোবর্দ্ধন আলোচ্য কথার মোড় ঘুরাইয়া লইয়া, শিবরাত্রির দিন কি ভাবে সুশৃঙ্খলে তাঁহাদের বিশ্বনাথ দর্শন করাইবে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল।

৯

শিবরাত্রির গাম্ভীর্য্যময় সৌন্দর্য্যে বারাণসী আজ ঝলমল করিতেছে; হর হর ব্যোম ব্যোম রবে কাশী আজ মুখরিত।—কিন্তু এমন পুণ্যদিনেও স্বার্থপর ভণ্ড নরপশুরা তাহাদের পাপাচরণে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; বিশ্বনাথের মন্দির-সন্নিহিত সকল গলি-পথেই সমভাবে বিপুল জনস্রোত চলিয়াছে।

শিখা এই জনতা দেখিয়া গোবর্দ্ধনকে বলিল,—"চল ঠাকুরপো, ফিরে যাই; বিষম ভীড় আজ।"

গোবর্দ্ধন বলিল,—"এসে ত পড়েছি, এখন ফিরতেও যতখানি, এগুতেও ততখানি।"

লোকের ভীড় হইতে কতকটা পরিত্রাণ পাইবার জন্য গোবর্দ্ধন শিখাকে লইয়া মানমন্দিরের রাস্তায় ঢুকিয়া চার পাঁচটা গলি অতিক্রম পূর্ব্বক একখানি চিত্র-বিচিত্র করা বাড়ীর দেউড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

শিখা একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কোথায় আনলে, ঠাকুরপো?"

গোবর্দ্ধন হাসিয়া বলিল,—"ঠিক যায়গাতেই এনেছি, এই বাড়ীতেই সেই সাধু আস্তানা নিয়েছেন। চল এবার উপরে উঠে সাধু দর্শন করা যাক।"

রাস্তার উপরেই বাড়ীর দেউড়ীযুক্ত চৌতারা। তাহারই উপর দিয়ে

সোপানশ্রেণী দ্বিতলের বারান্দায় উঠিয়াছে ; বারান্দা সুদৃশ্য রেলিং দিয়া ঘেরা ; বারান্দার উপর দিয়াই ভিতরের কামরায় যাইবার পথ।

এই বাড়ীর দেউড়ী ও বারান্দার উপর বিজলীর আলোক জ্বলিতেছিল। নিকটস্থ কোনও দেব-মন্দিরের ডায়নামোর সহিত সংযোগে সৌখীন গৃহস্বামী এই বাড়ীতেও বিজলীর আলো আনাইয়াছিলেন। তখনও কাশীর রাস্তায় বিজলী বাতির আলো জ্বলে নাই।

শিখা গোবর্দ্ধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বারান্দায় উঠিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল। সেখান হইতে চারিদিকে ও গাড়ী-বারান্দার সম্মুখবর্ত্তী অপ্রশস্ত গলি-পথে চাহিয়া দেখিল, সর্ব্বত্রই লোক চলাচল করিতেছে, যাত্রিকণ্ঠের কোলাহলে সে স্থান পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। বারান্দার পরেই একটা অনতি-পরিসর দরদালান, তাহার পার্শ্বে-ই সুবিস্তৃত সুসজ্জিত হল-ঘর, ঘরের মধ্যে দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর গোবর্দ্ধনের কথিত সাধু সমাসীন। সাধুর পরিধানে গৈরিক বর্ণের রেশমী ধুতি, তদনুরূপ ঢিলা পাঞ্জাবী, মাথায় ঐ বর্ণেরই পাগড়ী ; সাধুর স্বর্ণতুল্য অত্যুজ্জ্বল বর্ণের উপর গৈরিক বর্ণের সুসঙ্গত পরিচ্ছদ। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকসম্পাতে তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্য ঝলসিয়া উঠিতেছিল।

গোবর্দ্ধন সসম্ভ্রমে সাধুকে প্রণাম করিল, শিখাও যুক্ত-করে মস্তক নত করিয়া সাধুকে অভিবাদন করিল। কিন্তু পরক্ষণে সাধুর মুখের দিকে চাহিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল,—অতিকায় অজগর তাহার খরতর দৃষ্টির ধাঁধায় ফেলিয়া অসহায় ক্ষুদ্র পশুদিগকে যে ভাবে মুখের দিকে টানিয়া লয়, অজগররূপী এই সাধুটার দুইটা উজ্জ্বল চক্ষুর লালসা-ব্যঞ্জক ভয়াবহ দৃষ্টিও ঠিক সেই ভাবে শিখাকে যেন তাহার দিকে আকর্ষণ করিতেছিল! বিস্ময়াতঙ্কে অভিভূত হইয়া শিখা গোবর্দ্ধনের দিকে চাহিল।

গোবর্দ্ধনের চক্ষুও তখন প্রকৃতিস্থ ছিল না। শিখার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইবামাত্র সে একটু থতমত খাইয়া বলিয়া উঠিল,—"বাবা, আমরা এসেছি আপনার কাছে, এঁর হাতটা একবার দেখতে হবে।"

সাধু আবার শিখার দিকে চাহিল, আবার সেই দৃষ্টি ; শিখার অপরূপ রূপ দেখিয়া সাধুর বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল।

শিখা বলিল,—"ঠাকুরপো, আজ ফিরে চল, আর এক দিন আসা যাবে, আমার শরীরটা কেমন করছে।"

এবার সাধুর কথা ফুটিল ; পরিষ্কার বাঙ্গালায় সাধু বলিল,—"কামনা নিয়ে সাধুর কাছে এসে না জানিয়ে ফিরে যেতে নেই। তাতে অপরাধ হ'য়। সাধুর কাছে লজ্জা কিসের? উঠে এসে ব'স—"

গোবর্দ্ধনও সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "উঠে ব'স বউদি, রাত হয়ে যাচ্ছে, দেরী ক'রে কি ফল, হাত দেখাও না—"

অভিভূতের মত শিখা ফরাসের উপর উঠিয়া বসিল। এই সাধুটিকে তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। অথচ তাঁহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া ফিরিয়া যাইবারও শক্তি তাহার ছিল না—তুমুল সন্দেহের মধ্যেও নারীসুলভ অদৃষ্ট-পরীক্ষার কৌতুহলটুকুও তখনও তাহার মনের দ্বারে ধীরে উঁকি দিতেছিল।

সাধু একটু ঝুঁকিয়া শিখার বাম হাতখানি দুই হাঁতে তুলিয়া ধরিল, হাতে টান পড়ায় শিখা সাধুর দিকে আর একটু অগ্রসর হইয়া বসিল, কিন্তু তাহার বুক তখনও কাঁপিতেছিল।

সাধু শিখার সেই অনিন্দ্যসুন্দর কুসুমকোমল করপুট দুই করের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা পরীক্ষার ভঙ্গীতে টিপিতে লাগিল ; ঠিক এই সময় গোবর্দ্ধন

পা টিপিয়া অতি ধীরে ধীরে সেই বৃহৎ হলঘরের দরজা দিয়া পাশের কক্ষে সরিয়া পড়িল।

সহসা হলঘরের উজ্জ্বল আলো নিবিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে সাধুর দুইখানি সবল বাহুর নিবিড় বেষ্টনে শিখার কমনীয় দেহখানি আবদ্ধ হইল। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য, লাঞ্ছনার সূচনাতেই ভগবতী জাগ্রতা হইলেন।

যে মুহূর্ত্তে এই কদর্য্য ব্যাপার ঘটিল, তাহার পরমুহূর্ত্তেই সাধুবেশী শঙ্করলালের মর্ম্মভেদী তীব্র আর্ত্তনাদে সেই অন্ধকারময় হলঘর খানি কাঁপিয়া উঠিল; পরক্ষণেই সর্ব্বত্র বিজলীর আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং পার্শ্বের ঘর হইতে গোবর্দ্ধন ও শঙ্করলালের কয়েক জন অন্তরঙ্গ চেলা শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া বজ্রাহতবৎ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

সে কি হৃদয়ভেদী ভয়াবহ দৃশ্য!—প্রকাণ্ড একটা তাকিয়ার উপর শঙ্করলালের বিশালদেহ এলাইয়া পড়িয়াছে, স্ত্রীলোকের মাথার চুল বাঁধার জন্য তৈয়ারী সোনার তারে জড়ানো সজারু-নামক জানোয়ারের এক জোড়া সুতীক্ষ্ণ বিঘত-প্রমাণ লম্বা কাঁটার অর্দ্ধাংশেরও অধিক তাহার দক্ষিণ চক্ষুটির ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে! ফিন্‌কি দিয়া তখনও রক্ত ছুটিতেছে, রক্ত-ধারায় শুভ্র ফরাস, তাকিয়া ও শঙ্করলালের গৈরিক বসন হোলীর উৎসবকালের মত সুরঞ্জিত!—আর পতনোন্মুখিনী শিখা তখন অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া ফরাস হইতে নামিয়া সেই হলঘরের কার্পেট-পাতা মেঝের উপর দাঁড়াইয়াছে—তাহার দেহলতাখানি তখন বিদ্যুল্লতার মত দুলিতেছে।

গোবর্দ্ধন অতি ব্যস্তভাবে ফরাসের উপর উঠিয়া পড়িয়া শঙ্করলালের চক্ষুকোটর হইতে সতীহস্তের সেই ভীষণ অস্ত্রখানি সবলে টানিয়া বাহির

করিয়া দূরে কার্পেটের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল ; দারুণ যাতনায় পুনরায় আর্ত্তনাদ করিয়া আহত শঙ্করলাল মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ঘরের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি ঠিক এই সময় এই তরুণীকে ভবিষ্যৎ আতঙ্কে অস্থির করিয়া তাহার অনিচ্ছায় তাহাকে সেই ভয়াবহ ঘরের বাহিরে লইয়া গেল—মুক্ত বারান্দায় দাঁড়াইয়া নৈশ-বায়ুর স্নিগ্ধ স্পর্শে সে যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল।

শঙ্করলালের চেলাদের বীরত্ব এইবার বিস্ফুরিত হইবার অবকাশ পাইল। প্রভুর মুখের গ্রাস প্রভুকেই ঘাল করিয়া সরিয়া পড়িতেছে দেখিয়া তাহারা হুঙ্কার করিয়া শিখাকে আটকাইতে ছুটিল। শিখা তখন নিজের বিপদ্ বুঝিয়া লইল। সে এবার অসমসাহসে সেই বারান্দার রেলিঙে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া তাহার আততায়ীদের দিকে তর্জ্জনী তুলিয়া দৃপ্তস্বরে বলিল,—"এখানে এলেই আমি চীৎকার ক'রে লোক ডাকব, পুলিস দিয়ে তোমাদের সকলকে ধরিয়ে দেব!"

চেলারা স্তম্ভিতভাবে ফরাসে শায়িত আহত প্রভু ও তাহার শুশ্রূষায় তৎপর গোবর্দ্ধন ও অপর দুইজন সঙ্গীর দিকে নিরুপায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। প্রভুর তখন কথা কহিবার অবস্থা নহে। গোবর্দ্ধন বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, শিকার এমন স্থানে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে, যেখান হইতে পাকড়াও করিতে গেলেই একটা গোলমাল হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ এ পর্য্যন্ত সে ও তাহার প্রভু অনেক শিকারের সংস্পর্শে আসিলেও এমন মারাত্মক শিকার কখনও দেখে নাই এবং এ হেন জবরদস্ত শিকারীও কখনও শিকারের হস্তে এ ভাবে জখম ও ঘাল হইয়া পড়ে নাই! এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাহার এখন প্রথমে ও প্রধান চিন্তা হইল, ইহার কি পরিণাম? শিখাকে জোর করিয়া আটকাইয়া রাখা

অথবা তাহার হাতে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া একটা রফা করা—কি কর্ত্তব্য, তাহাই সে স্থির করিতে পারিল না।

কয়েক মুহূর্ত্তের চিন্তায় কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া গোবর্দ্ধন এবার নিজেই উঠিল ; কিন্তু ঠিক সেই সময় বারান্দার উপর শমনতুল্য এক ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার দুই চক্ষু স্বভাবতই মুদিয়া আসিল, কাঁপিতে কাঁপিতে সে ফরাসের উপর বসিয়া পড়িল।

১৩

ঠিক যে সময় শিখা বারান্দা হইতে দৃপ্তস্বরে বলিতেছিল—পুলিস দিয়ে তোমাদের ধরিয়ে দেব,—সেই সময় বেন্যারস ডিষ্ট্রিক্ট পুলিসের বড় কর্ত্তা রায় বাহাদুর এই পথ দিয়া সদলবলে বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে যাইতেছিলেন। শিখার কথাগুলি বিউগলের মত তাঁহার কাণে বাজিয়া উঠিল। তিনি বারান্দার দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। শঙ্করলালের এই বিলাস-ভবনটির সহিত তিনি অপরিচিত ছিলেন না, কাশীর খুঁটি-নাটি প্রত্যেক সংবাদ তাঁহার কর্ণে আসিয়া পৌছাইত। এই বিলাসী যুবকের রমণীপ্রীতি সম্বন্ধে অনেক কদর্য্য কুৎসিত কথা তাঁহার শ্রুতিস্পর্শ করিলেও তিনি, প্রমাণসঙ্গত কোনও তথ্য এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তত্রাচ শঙ্কররালের উপর তাঁহার সংশয় ও লক্ষ্য কতকটা ছিল; আজ সেই সন্দিগ্ধ মানুষটির বিলাসবাটীর অলিন্দ হইতে বাঙ্গালী যুবতীর এই মর্ম্মবাণী তাঁহাকে চমৎকৃত করিল।

রায় বাহাদুরের সঙ্গে কয়েকজন পুলিসপ্রহরী এবং জনৈক প্রিয়দর্শন যুবক ছিল। এই যুবকটি অবসরকালে স্বেচ্ছায় রায় বাহাদুরের কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। রায় বাহাদুর তাহাকে ছোট ভাইএর মত ভালবাসেন। যুবকটি কাশীর উদীয়মান কোন বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী।

রায় বাহাদুর এই স্নেহাস্পদ সহচরকে পার্শ্বে ডাকিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বুঝছ?"

যুবক বলিল,—"আর বোঝাবুঝি কি, উঠে পড়ুন, অঘটন কিছু ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"এ কার বাড়ী জান? পাণ্ডাকুলের প্রিন্স অব ওয়েলস্—শঙ্করলালের।"

যুবক উৎসাহভরে বলিয়া উঠিল,—"এই রত্নটিকেই না আপনি অনেক দিন থেকে জালে গাঁথবার চেষ্টায় আছেন? দেখুন, বিশ্বনাথ হয় ত আজ আপনার কামনা পূর্ণ করতেই এ পথে আপনাকে এনেছেন! দেখুন, দেখুন—মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবে কাঁপছে, প'ড়ে না যায়—"

রায় বাহাদুর তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রহরীদিগকে চৌতারার নিকট মোতায়েন করিয়া দ্রুতপদে উপরে উঠিতে লাগিলেন। যুবকও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

বারান্দায় পদার্পণ করিবামাত্র শিখার অগ্নিশিখাবৎ জ্বলন্ত চক্ষু দুইটি তাঁহার উপর পড়িল। রায় বাহাদুর দেখিলেন—সেই চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুৎ ঝলসিত হইতেছে। তাহার সুন্দর প্রদীপ্ত মুখখানি সিন্দূরের মত আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠদুটি কি যেন বলিবার জন্য কাঁপিতেছে, কিন্তু কথা বাহির হইতেছে না। ঘরের ভিতরের দিকে চাহিবামাত্র রায় বাহাদুর যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মত বিচক্ষণ ব্যক্তির বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, যাহারা রোক করিয়া এই মেয়েটির দিকে ঝুঁকিয়াছিল, তাঁহাকে হঠাৎ দেখিয়াই শিষ্টের মত পিছু হঠিয়াছে।

রায় বাহাদুর অগ্রসর হইয়া সস্নেহে বলিলেন, "কি হয়েছে মা? কেন অমন ক'রে চীৎকার করছিলে? সব বল ত মা, নির্ভয়ে বল; আমরা পুলিসের লোক।"

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে শিখা প্রবীণ রায় বাহাদুরের সেই সৌম্য গম্ভীর মূর্ত্তিটি দেখিয়া যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইল। তাঁহার মুখের উপর চক্ষু দুইটি তুলিয়া সে বলিল, "আপনি পুলিসের লোক? আমাকে রক্ষা করুন।"

অবিচলিত দৃঢ়স্বরে রায় বাহাদুর বলিলেন, "নিশ্চয়; তুমি যদি কাশীর মেয়ে হও মা, আমার নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবে—আমাকে কাশীর সকলে রায় বাহাদুর ব'লে জানে।"

শিখা মুখ নত করিয়া বলিল, "আমি কলকেতার মেয়ে, তা হলেও যে বাসায় আমি থাকি, সেখানে আপনার নাম শুনেছি। আপনি চোর-ডাকাতের যম। আমিও আজ ডাকাতের হাতে পড়েছি, আমাকে রক্ষা করুন।"

রায় বাহাদুর বলিলেন, "কি হয়েছে মা, অকপটে আমাকে সব বলতে হবে। ভিতরে চল মা, কোন ভয় নেই; ঐ দেখো, নীচে আমার পাহারাওয়ালারা দাঁড়িয়ে আছে।"

হলঘরের সেই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া রায় বাহাদুর চমকিয়া উঠিলেন। ফরাসের এক পার্শ্বে গোবর্দ্ধন বসিয়াছিল। রায় বাহাদুরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই সে সভয়ে মুখ লুকাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু রায় বাহাদুর তৎপূর্ব্বেই সশ্লেষে বলিয়া উঠিলেন, "আরে কে-ও!—হ্যালো মাইডিয়ার ওল্ড ফ্রেণ্ড! তুমিও এখানে এসে জুটেছ? বাহোবা!"

কার্পেটমণ্ডিত কক্ষতলে কয়েকখানি খুরসী পাতা ছিল। রায় বাহাদুর সস্নেহে শিখার হাত ধরিয়া একখানি খুরসীর উপর তাহাকে বসাইয়া দিয়া স্বয়ং তাহার সম্মুখে বসিলেন। যে যুবকটি তাঁহার সঙ্গে ছিল, সেও তাঁহার পশ্চাতে আর একখানি খুরসী অধিকার করিয়া বসিল।

শঙ্করলাল তখন সংজ্ঞা পাইলেও রায় বাহাদুরের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই

আতঙ্কে পুনরায় অচৈতন্যের ভাণ করিল। রায় বাহাদুরের উপস্থিতি তাহার আর্ত্তনেত্রের অসীম যন্ত্রণা অপেক্ষাও মর্ম্মন্তুদ হইতেছিল ; হতভাগ্যের অপর নেত্রটিও সহচরের ভীষণ অবস্থা দেখিয়া আপনিই মুদ্রিত হইয়া গেল।

রায় বাহাদুর বলিলেন, "গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনা আমাকে খুলে বল মা, কি ক'রে এখানে এলে, কে এ কাণ্ড করেছে, সমস্ত আমি শুনতে চাই।"

শিখার পদতলে তাহার আত্মরক্ষার সেই অস্ত্র পড়িয়াছিল। ধীরে ধীরে সেটিকে তুলিয়া লইয়া উজ্জ্বল চক্ষুযুগল রায় বাহাদুরের মুখের উপর তুলিয়া সে দৃঢ় অথচ গাঢ় স্বরে বলিল, "দেখুন, এটা আমারই চুলের কাঁটা, এই এ কাণ্ড করেছে ; আর এরই জন্যে ঐ পাষণ্ডের হাত থেকে আমি আমার সম্মান রক্ষা করতে পেরেছি। এখন আমার ইতিহাস শুনুন।"

তখন শিখা কাশীর ষ্টেশন হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য এই ভণ্ড সাধুকে আক্রমণ পর্য্যন্ত সমস্ত কাহিনী রায় বাহাদুরের নিকট যথাযথ প্রকাশ করিল।

শুনিতে শুনিতে রায় বাহাদুরের মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। বার বার তিনি শয্যাশায়ী পাষণ্ড ও তাহার বাহন গোবর্দ্ধনের উপর দৃষ্টি-সঞ্চার করিতেছিলেন। গোবর্দ্ধন রায় বাহাদুরকে ভালরূপেই চিনিত। সে তাঁহার ভয়াবহ দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য জানুদ্বয়ের মধ্যে মস্তক লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

সকল কাহিনী বলিয়া মুখখানি নত করিয়া শিখা বলিল,—"আত্ম-রক্ষার জন্যই আমি এ নিষ্ঠুর আঘাত করেছি, এ ভিন্ন আমার আর রক্ষার উপায় ছিল না ; হয় ত এ জন্য আমার শাস্তি হবে, কিন্তু আমি নির্দ্দোষ।"

রায় বাহাদুর দৃপ্ত স্বরে বলিলেন,—"তোমার কখনও শাস্তি হ'তে পারে

না, মা। বরং এ সাহসের জন্য তোমার উপযুক্ত পুরস্কার পাওয়াই উচিত। ভাল কথা, এইবার আমি তোমার পরিচয় জানতে চাই, মা; তোমার বাপের কি নাম, মা?"

শিখা মুখ নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"আমার বাবার নাম শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন মণ্ডল, আমাদের—"

রায় বাহাদুরের প্রিয় সহচর এতক্ষণ স্তম্ভিতভাবে এই তেজস্বিনী তরুণীর ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে অসীম কৌতূহলের সহিত তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। অপরিচিতা তরুণীর এই বিপন্ন অবস্থায় পুনঃ পুনঃ তাহার উপর দৃষ্টিপাত নিন্দনীয় জানিয়াও, যেন কোন অতীত স্মৃতির আকর্ষণে—এই মুগ্ধ যুবকের সন্দিগ্ধ চক্ষু এই তরুণীর অরুণ-বর্ণ মুখের উপর আকৃষ্ট হইয়াছিল। এইবার সে যেন সহসা সর্পাহতবৎ চমকিয়া ক্ষিপ্রভাবে লাফাইয়া উঠিয়া শিখার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বিস্ময়বিস্ফারিত দুই চক্ষু তাহার শ্রান্ত মুখখানির উপর তুলিয়া সে বলিয়া উঠিল—"তুমি—শিখা?"

এ যে সেই চিরস্মৃতিমাখা চিরপরিচিত সুমধুর স্বর! শিখা স্তব্ধ হইল, সমস্ত ভুলিয়া গেল, মুগ্ধের মত সে প্রশ্নকর্ত্তার প্রদীপ্ত মুখখানির উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিল, তাহার কাম্য, তাহার ইষ্ট, তাহার ধ্যান, তাহার দেহ ও মনের দেবতা, এই দারুণ দুর্যোগের মধ্যে তাহারই সম্মুখে!

মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠিয়া শিখা অরিন্দমের পদতলে মস্তক নত করিল।

রায় বাহাদুর অরিন্দমের কাহিনী সমস্তই শুনিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার আর বুঝিতে কিছু বিলম্ব হইল না।

* * * *

পরদিন অরিন্দমের অসির বাসায় শিবরাত্রির পারণের মহোৎসবে রাজীবলোচন সপরিবার আমন্ত্রিত হইয়া রায় বাহাদুরের মধ্যস্থতায় সমস্তই শুনিলেন।

রায় বাহাদুর বলিলেন,—“মণ্ডল মশাই, আপনার জামাতা দেশের ডাকে বাঙ্গালা দেশের বাইরে এসে প’ড়ে সরকারের চক্ষুঃশূল হয়েছিলেন। বাবাজীর উপর আমাদের খুব কড়া নজরই ছিল, যদিও পরে জানা গিয়েছিল—তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, কোন গলদ তাঁতে নেই! শেষে ঘটনাচক্রে এক দিন উনি গুপ্তঘাতুকের হাত থেকে আমার প্রাণ বাঁচিয়ে দেন, সেই থেকে আমি ওঁকে ছোট ভাইএর মত দেখে আসছি আর আমারই একটু চেষ্টার ফলে—আপনার জামাতা আজ কাশীর একজন বড় মার্চ্চেণ্ট।”

অরিন্দম ভক্তিভরে শ্বশুর মহাশয়ের পদধূলি লইয়া বলিল,—“শিবরাত্রির পরই আমি চরণদর্শন করতে কলকাতায় যেতাম, আমার ভাগ্যফলে এখানেই দেখা হয়ে গেল।”

রায় বাহাদুর রাজীবলোচনকে বলিলেন,—“মণ্ডল মহাশয়, সে কালের সরল যুগ চ’লে গেছে; উপকারের বিনিময়ে অপকার পাওয়াই হচ্ছে এ যুগের ধারা; সরল বিশ্বাসটা এ ভাবে যার তার ওপর ন্যস্ত করবেন না! গোবর্দ্ধনের কাণ্ড দেখে আপনিও এবার সতর্ক হোন।”

রাজীবলোচন বলিলেন,—“কাশী এমন তীর্থস্থান, বিশ্বনাথের ধাম, এখানেও এমন কুৎসিত কাণ্ড হয়—এমন নরকের পিশাচ ভদ্রবেশে এখানে শিকার খুঁজে বেড়ায়—তা ত স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, রায় বাহাদুর!”

জাগ্রতা ভগবতীর অঙ্গাভরণ প্রহরণরূপে শঙ্করলালের নেত্রে যে নিরবচ্ছিন্ন দাহ সঞ্চার করে, তাহা হইতে মুক্তি কামনায় সেই রাত্রেই হতভাগ্য রিভলভারের সহায়তা লয়। শঙ্করলালের এই আকস্মিক

আত্মহত্যায় সে সময় কাশীতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত সংবাদ কয়জন জানে?

রায় বাহাদুরের কৃপায় ব্যাপারটা আর বেশী দূর গড়াইবার অবকাশ পায় নাই। তবে গোবর্দ্ধনও সহজে নিষ্কৃতি পায় নাই। রায় বাহাদুর গোবর্দ্ধনকে অরিন্দমের বাড়ীর সম্মুখস্থ হাতায় তাঁহার আরদালীর দ্বারা পাকড়াও করিয়া আনিয়া—স্বহস্তে পঁচিশ কশা লাগাইয়া ভবিষ্যতের জন্য তাহাকে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

* * * *

অরিন্দমের বাসাতেই রাজীবলোচন তাঁহার লটবহর লইয়া উঠিয়া আসিলে, সেইদিনই শিখা তাহার মাকে বলিল,—"চল মা, এবার এক দিন আমরা ঘটা ক'রে বিশ্বনাথের পূজো দিয়ে আসি।"

মা বলিলেন,—"দেব বৈ কি মা, বাবার কৃপায়—বাবার ধামে এসে আমরা যে আমাদের হারানিধি ফিরে পেয়েছি।"

জাগ্রতা ভগবতী

দুর্গা

তিন

১

গাড়ী হইতে নামিয়াই সম্মুখে বাড়ীর বিশাল দেউড়ী ও তক্‌মাধারী দরোয়ান দেখিয়া দুর্গার মাথা ঘুরিয়া গেল। সঙ্কোচকে যতদূর সম্ভব সংযত করিয়া, ঘোমটার ভিতর দিয়া সে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাইল; কিন্তু স্বামী রামদাস তখন তোরঙ্গ ও বিছানার মোট লইয়া ব্যস্ত,—চোখোচোখি হইবার কোনও সম্ভাবনা দেখা গেল না। অনতিবিলম্বেই দরোয়ানের আহ্বানে ভৃত্যগণ আসিয়া পড়িল। রামদাস মালপত্র তাহাদের জিম্বা করিয়া দিয়া দুর্গার দিকে চাহিতেই সবিস্ময়ে দেখিল, অবগুণ্ঠনের পরিবেষ্টনকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দুইটি বড় বড় চক্ষুর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি তাহার দিকে পড়িয়াছে এবং অবাক্ হইয়া যেন প্রশ্ন করিতেছে,—কোথায় আনলে আমাকে?

মুখে গর্ব্বের হাসিটুকু টানিয়া আনিয়া স্ত্রীর উদ্দেশে রামদাস কহিল,—আমাদের বাবুর বাড়ী গো! এ-তল্লাটে এত বড় বাড়ী আর নেই।

সুতরাং এই বড় বাড়ীর ভিতরেই যে তাহাকে নির্ব্বিচারে স্বামীর সহিত প্রবেশ করিতে হইবে, স্বামীর কথা ও দেউড়ীর দিকে তাহার অগ্রসর হইবার ভঙ্গীতে দুর্গার তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই।

অনেকগুলি উৎসুক দৃষ্টির উপর দিয়া বাহির-মহল পার হইয়া স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্গা এই বড় বাড়ীর এমন একটি অংশে আসিয়া উপস্থিত হইল, যে স্থানটি একান্ত নিরিবিলি এবং সকল রকমেই বাহিরের আড়ম্বর

হইতে মুক্ত। দুইখানি ঘর, ছোট একটু দালান ও সম্মুখের প্রাঙ্গণটুকু বিশাল অট্টালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াও যেন সম্ভ্রমের সহিত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে।

দালানটির উপর পা দিয়া দুর্গা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু তাহার মনের মধ্যে যে অস্বস্তি গুমরিয়া উঠিতেছিল, তখনও তাহা শান্ত হয় নাই। স্বামীর দিকে চাহিয়া সে কহিল,—এই তোমার আলাদা বাসা ?

রামদাস এ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। কহিল—বাড়ী খুঁজতে কসুর করিনি, কিন্তু ঠিক আমাদের যেমন দরকার, তেমন বাড়ী একখানাও সারা সহর ঘুরে খুঁজে পাইনি।

দুর্গা কহিল,—তা হ'লে এত তাড়াতাড়ি আমাকে আনবার কি দরকার ছিল ? তুমি ত জান, বার বার আমি তোমাকে মিনতি করেছি, বাবুদের বাড়ীতে আমাকে তুলো না,—আলাদা বাসা আমাদের চাই। সারা মালতীপুর সহরের ভেতর খোলার ঘরও কি একখানা পাওয়া যেত না ?

রামদাস কহিল,—তা হয় ত পাওয়া যেত; কিন্তু খোলার ঘরে তোমাকে নিয়ে তোলা—

দুর্গা একটু তিক্তস্বরেই কহিল,—মানে আঘাত লাগত বুঝি ? আর, বাবুর বাড়ীতে এ ভাবে পরিবার নিয়ে ঢুকতে মাথাটা সম্মানে উঁচু হয়ে উঠেছে!—আমার মনে আরও বেশী বাজ্ছে এই ভেবে যে বরাবর তুমি কথাটা চেপে এসেছ; যতবার জিজ্ঞাসা করেছি, ততবারই বলেছ,—ভালো বাসাই পেয়েছি।

রামদাস হাসিয়া উত্তর দিল,—ভালোবাসাই ত পেয়েছি দুর্গা, এখন

তুমি ভালোবাসলেই এ পাওয়াটা সার্থক হয়।—তুমি যদি ভেবে থাক, আমি বাবুর গায়ে-পড়া হয়ে তাঁর বাড়ীতে ঢুকেছি, তোমাকে এনেছি, এটা তোমার মস্ত ভুল। আমি বাসা খুঁজছি শুনে বাবু নিজেই আমাকে ডেকে জানিয়ে দিলেন, আমি যখন পরিবার আনছি, তখন স্বচ্ছন্দে এই মহলে থাকতে পারি। কেন না, আমি যে কাযে বাহাল আছি, এই বাসা অমনি-পাওয়াটাও তার মধ্যেই, তবে পরিবার নিয়ে না থাকলে এ বাসা দেওয়া হয় না, এর পাশেই বাবুদের অন্দরমহল কি না। তা এতে দোষ কি হয়েছে শুনি?

দুর্গা আর কোনও উত্তর দিল না,—জিনিসপত্রগুলি গোছগাছ করিবার দিকে তাহার মনোযোগ দেখা গেল। রামদাস স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ফাঁড়া তাহার কাটিয়া গিয়াছে।

২

রামদাস তিনটি বৎসর বাবুদের বাহির-মহলে অষ্ট প্রহর কাটাইয়াও কাহারও মনে কিছুমাত্র বিস্ময়ের সঞ্চার করিতে পারে নাই ; কিন্তু দুর্গা আসিয়া তিনটি অহোরাত্রের মধ্যেই বড় বাড়ীর বড় ছোট সকলকেই তাহার অনন্যসাধারণ আচরণে সচকিত করিয়া তুলিল।

বড় বাড়ীর যিনি বর্ত্তমানে কর্ত্তা, বিধাতা তাঁহাকে সকল রকমেই বড় করিয়াই বড় বাড়ীর কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন। কর্ত্তার নাম পুরুষোত্তমনারায়ণ সেন রায়। জাতিতে বৈদ্য। নামের অনুপাতে দেহের আয়তনও অসাধারণ, এবং পেশাও তদনুসারে বহুমুখী ও প্রত্যেকটিই অজগরবিশেষ! জমিদারীর বিপুল আয়, তেজারতীর সুদের আমদানী, কবিরাজী পেটেণ্ট ঔষধের ব্যাপার এবং নিজের ওকালতীর পসার,—প্রত্যেক পেশাটিই পাল্লা দিয়া যেন স্ব স্ব আয়ের অঙ্ক বড় করিয়া দেখাইতে ব্যগ্র!

পুরুষোত্তমনারায়ণের কর্ম্মজীবনের চরম সার্থকতাও এইখানেই,—এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের সুপ্রতিষ্ঠার সফলতায়। সুতরাং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অধিকাংশ সময় তিনি ইহাদের পরিচর্য্যায় কাটাইয়া দেন।

কিন্তু তাঁহার শিক্ষিতা সহধর্ম্মিণী প্রতিমার প্রকৃতি বিধাতা অন্য ধাতুতে গড়িয়া এই বড় বাড়ীর বধূ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। স্বামীর বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা প্রতিমাকে যে পরিমাণে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহার অনুপাতে অধিকতর পীড়া দিয়াছিল ঐশ্বর্য্যের প্রতি তাঁহার একান্ত আন্তরিকতা এবং মধুর দাম্পত্য-জীবনের চিরবাঞ্ছনীয় রসোপভোগে গভীর বিতৃষ্ণা।

দুর্গা

প্রতিমার বাবা ছিলেন ডেপুটী। বঙ্গের বিভিন্ন সবডিভিসনে তাঁহাকে ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে। প্রতিমাও বরাবর পিতার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছে। প্রগতিশীলা নারীসমাজে মিশিয়াছে, সভা করিয়া নাম বাজাইবার কৌশলগুলি ভাল ভাবেই শিখিবার সুযোগ পাইয়াছে। শিক্ষার পথেও সে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার অবকাশ পায় এবং প্রজাপতি-নির্ব্বন্ধের পূর্ব্বেই স্বামী সম্বন্ধে একটা মোটামুটি খসড়াও তাহার মানস-পটে কল্পনার তুলিতে আঁকিয়া রাখিতে ভুল করে নাই। কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় সমস্তই ওলট-পালট হইয়া গেল! তাহার কল্পিত আলেখ্যের সহিত পুরুষোত্তমনারায়ণের দেহের বিপুল আয়তন কিছুতেই খাপ খাইল না। বিবাহের পর স্বামীর ব্যবহারও মোটেই প্রতিমার প্রীতিপদ হইল না।

স্বামি-স্ত্রীর প্রথম আলাপনেই প্রতিমা প্রস্তাব তুলিল,—নাম নিয়েই সংসার, নামই সব; নামের সঙ্গেই মনের মিল। কিন্তু তোমার নামটা যে রকম লম্বা আর বেয়াড়া, আমার পক্ষে বরদাস্ত হওয়া অসম্ভব। আমি ও-নামটাকে কেটেছেঁটে ছোট করতে চাই।

স্ত্রীর কথা শুনিয়া স্বামী একেবারে অবাক্! কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর প্রশ্ন করিল,—নাম আমার বড় ব'লে যদি তোমার বরদাস্ত না হয়, তাকে অপারেশন ক'রে ছোট করলে আমার বরদাস্ত হবে কেন?

প্রতিমা কহিল,—আগেই ত বলেছি, মনের মিলটুকু বজায় রাখবার জন্য।

স্বামী সবিস্ময়ে কহিলেন,—নামের সঙ্গে মনের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ? ভাল, তোমার কি অভিপ্রায়?

প্রতিমা কহিল,—অভিপ্রায় আর কিছু নয়, তোমার ঐ কদর্য্য

নামটার একটা ভদ্র সংস্করণ! প্রথম শব্দটা একবারে অচল, শেষেরটার গোটাকতক অক্ষর তুলে অদলবদল ক'রে আমি ঠিক করেছি—নরেন। অতঃপর তুমি আর পুরুষোত্তমনারায়ণ নও, তোমার নাম হ'ল—নরেন।

পুরুষোত্তমনারায়ণ গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—আমরা হচ্ছি জমিদার মানুষ, বরাবরই রক্ষণশীল; গ্রহণ করাটাই আমাদের ধর্ম্ম, বর্জ্জন করতে মোটেই অভ্যস্ত নই; কাযেই একটি অক্ষরও ত্যাগ করতে পারব না।

প্রতিমা বুঝিল, তাহার হিসাবে ভুল হইয়াছে; স্থূলদেহের অধিকারীর বুদ্ধিও দেহের অনুযায়ী, ইহাই ছিল তাহার ধারণা; কিন্তু স্বামীর অঙ্গে আঁচোড় দিয়াই সে জানিতে পারিল, অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিও অতিশয় স্থূলদেহকে আশ্রয় করিতে পারে।

পুরুষোত্তম বুঝিলেন, হাকিমের মেয়ে; হুম্‌কী দিয়া কায আদায় করিতে চায়; দুর্ব্বলতা কোন সূত্রে প্রকাশ করিলে আর নিস্তার নাই।

পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যের অসদ্ভাব সত্ত্বেও শেষে তাহাদের মধ্যে একটা রফা হইয়া গেল যে, বাহির-মহলে স্বামীর কোনও কার্য্যে প্রতিমা কোনও কথা কহিতে পারিবে না, এবং অন্দর-মহলে পত্নীর কার্য্য-কলাপেও পুরুষোত্তমের কটাক্ষপাতের কোনও অধিকার থাকিবে না। সুতরাং বহির্মহল জমিদারীর কার্য্যে বা জমিদারের সম্ভ্রমরক্ষার অনুকূলে পদস্থ রাজপুরুষ ও বিশিষ্ট সুহৃদ্বর্গের সম্বর্দ্ধনায় প্রায় প্রতি সপ্তাহের শনিবাসর সহরের শ্রেষ্ঠা গায়িকাদের কলকণ্ঠে কল্লোলিত হইয়া উঠিলেও, প্রতিমার ভ্রমরকৃষ্ণ সুবঙ্কিম ভ্রূ যুগল কোনও দিন কুঞ্চিত হইয়া উঠে নাই।

পক্ষান্তরে, অন্দরমহলে প্রতিমার সুসজ্জিত সুবৃহৎ ড্রয়িং-রুমে সহরের প্রগতিপন্না তরুণীদের সহযোগিতায় ঘন ঘন সভাধিবেশন ও সেই সভার স্বার্থপর পুরুষজাতির দাসত্বপাশ ছেদন সম্বন্ধে অগ্নিগর্ভ প্রস্তাবসমূহ বহির্মহলে পুরুষোত্তমনারায়ণের চায়ের পিয়ালায় কোনও দিন তুফান তুলে নাই,—এমন কি, নারীজাতির প্রতি স্বার্থপর পুরুষজাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ কতিপয় নাম-করা তরুণ সাহিত্যিকও অন্তঃপুরের এই প্রগতিসভায় আমন্ত্রিত হইয়া মধ্যে মধ্যে অগ্নিবর্ষণ করিয়া যায়—বিশ্বস্তসূত্রে ইহা জ্ঞাত হইয়াও পুরুষোত্তমের সুপুষ্ট গোঁফজোড়াটি একটি দিনও স্ফীত হইয়া উঠে নাই।

সহরের মুমূর্ষুপ্রায় বালিকাবিদ্যালয়টি প্রতিমার পরিপূর্ণ চেষ্টায় সহসা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল। প্রতিমা স্বয়ং পরিচালিকা; শিক্ষয়িত্রীদের তাহার ড্রয়িং-রুমে ডাকিয়া শিক্ষা-প্রণালী সে বাতলাইয়া দেয়,—সকল কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী কাটাইয়া মেয়েদের আদর্শ-নারী করিয়া তুলিতে হইবে, পুরুষের সহায়তা না লইয়াও তাহারা যাহাতে চলার পথে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিতে পারে—এই আকাঙ্ক্ষা তাহাদের চিত্তে পিপাসার মত জাগাইয়া দেওয়া চাই!

ছেলেদের স্কুলের চাঁই পুরুষোত্তমনারায়ণ স্বয়ং; সেখানে ছেলেদের প্রাচীনপন্থী করিয়া তুলিবার চেষ্টার ত্রুটি নাই,—রক্ষণশীল শিক্ষকদিগকেই সযত্নে নির্ব্বাচিত করা হয়; আধুনিকতার দূষিত বায়ু যাহাতে ছেলেদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে না পারে, সে বিষয়ে বিদ্যালয়ের পরিচালকসঙ্ঘ সদা সচেতন।

সুতরাং শুভ পরিণয়ের পর স্বামি-স্ত্রীর কর্ম্মজীবনের পথ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং উভয়ের মনোনীত পথে উভয়েরই খেয়ালের রথ যেন পাল্লা

দিয়া ছুটিতে আরম্ভ করে। বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া যায়, কিন্তু স্বামি-স্ত্রীর খেয়ালের দৌড় বাধা মানিতে চায় না; পূর্ণ সাতটি বৎসর ধরিয়া দোটানায় পড়িয়া বড়বাড়ীর অধিবাসী ও সমগ্র সহরের নরনারী যখন অতিষ্ঠ, ঠিক সেই সময় বড়বাড়ীর রথচক্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সর্ব্বপ্রথম শিহরণ তুলিল—দীনহীন মুহুরী রামদাস সরকারের সহধর্ম্মিণী দুর্গা!

দুর্গার পিতা অধ্যাপক নৃত্যলাল নন্দী মৃত্যুকালে এই মর্ম্মে উইল করিয়া যান যে, তাঁহার একমাত্র আদরিণী কন্যা দুর্গার বিবাহে পুত্রগণ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিবে। সমাজের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তাহাদিগকে দুর্গার উপযুক্ত বর খুঁজিতে হয়। কিন্তু তাহার বয়স ও বিদ্যা প্রবল অন্তরায় হইয়া উঠে। মেয়ে বি, এ, পাশ করিয়াছে শুনিয়াই বরের অভিভাবকরা প্রীতির পরিবর্ত্তে অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পিছাইয়া যায়; উচ্চশিক্ষিত যে সকল পাত্র দুর্গার বিদ্যা ও রূপের খ্যাতি শুনিয়া সাগ্রহে প্রার্থী হইয়া আসে, তাহাদের হঠকারিতা ও সামাজিক অপ্রতিষ্ঠা দুর্গার ভ্রাতাদের চিত্তে সংশয় উপস্থিত করে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যার বিদ্যা গুণ হইয়াও দোষ হইয়াছিল, দুর্গার বিদ্যাও শেষে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইল। বয়স তাহার তখন কুড়ি পার হইয়া গিয়াছে, আত্মীয়সমাজে কাণাঘুষার অন্ত নাই, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াদের মনে দারুণ অশান্তি। লেখাপড়া শিখিয়াও দুর্গা তাহার প্রকৃতিকে সংযত করিতে পারিত, স্রোতের মুখে ছাড়িয়া দেয় নাই কোন দিন; পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝিয়া সে নিজেই ভ্রাতাদের জানায়, সে যে লেখাপড়া শিখিয়াছে, পাশ করিয়াছে, এ সব কথা তাঁহারা যেন ভুলিয়া যান, পাড়ার আর পাঁচ জন মেয়ের মতই যেন তাহাকে পার করিবার ব্যবস্থা তাঁহারা করেন।

শেষে তাহাই হইল। রামদাসের পিতা হরিদাস সরকার দুর্গাকে দেখিতে আসিয়া তাহার রূপ, গড়ন ও চুলের প্রশংসা করিলেন, বয়স সম্বন্ধে যদিও কটাক্ষ করিলেন, কিন্তু পণের প্রাচুর্য্যে তাহা আর দোষ বলিয়া গণ্য হইল না। লেখাপড়া সম্বন্ধে মোটামুটি পড়িতে লিখিতে পারে,

এরূপ বলা হইয়াছিল, তাই রক্ষা, নতুবা কখনই তিনি এই বি, এ, পাস মেয়েটিকে তাঁহার ম্যাট্রিক-ফেল ছেলেটির বধূ করিতে ব্যগ্র হইতেন না। পাত্র-নির্ব্বাচন ব্যাপারে দীর্ঘকাল ধরিয়া পাত্রীপক্ষ এতই বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, বিদ্যার দিক দিয়া পাত্র-পাত্রীর এই অসামঞ্জস্য তাঁহারা অগ্রাহ্য করিতেই বাধ্য হন, বিশেষতঃ পাত্র পক্ষের ধন ও প্রতিষ্ঠার খ্যাতি তাঁহাদের এই দ্বিধাটুকু সহজেই নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিল। সরকার কোম্পানীর জুয়েলারী কার্য্যের তখন বিশেষ প্রতিষ্ঠা, ইঁহাদের কারখানার অলঙ্কার ভিন্ন সহরের কোনও ধনীর গৃহে শুভ বিবাহ কিছুতেই সুসম্পন্ন হইতে পারে না; প্রাসাদতুল্য আবাসভবন, নেত্রবিভ্রমকারী প্রদর্শনী-কক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকার অলঙ্কার দর্শকবৃন্দের বিস্ময় সৃষ্টি করে, সমগ্র সহর-ব্যাপী নাম-ডাক ;—সুতরাং এমন সুবিখ্যাত ব্যবসায়ীর ঘরে দুর্গার বিবাহ দিয়া তাহার ভ্রাতারা ভাবিলেন, খুব জিতিয়াছি। পক্ষান্তরে, সম্ভ্রান্ত বনেদী ঘরের সুন্দরী পুত্রবধূকে সাড়ম্বরে দায়বদ্ধ আবাসভবনে আনিয়া হরিদাস সরকার হিসাব করিয়া মনে মনে কহিলেন, খুব ঠকাইয়াছি !

দুর্গার ভ্রাতারা সরকার-কোম্পানীর বাহিরের নামডাক, বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর, ঠাটঠমক দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন ; কারবারের মূলে ঘুণ ধরিয়া এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটিকে যে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল, সে সন্ধান কেহই রাখেন নাই।—সরকার মহাশয়ের এই চালাকী বেশী দিন টিকে নাই ;—কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার তাসের প্রাসাদ ভাঙিয়া যায়, এবং সে আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকেও কালের কোলে ঢলিয়া পড়িতে হয়। দেনার দায়ে যথাসর্ব্বস্ব এমনভাবে বিকাইয়া যায় যে, রামদাসের মাথা রাখিবার বা উদরান্ন সংস্থান করিবার কোনও অবলম্বনই অবশিষ্ট থাকে নাই।

স্ত্রী ও বালিকা-কন্যা লইয়া রামদাসকে অবশেষে শ্বশুরালয়ে আশ্রয় লইতে হয়। দুর্ভাগ্যকে বরণ করিয়া দুর্গার যত না দুঃখ, কর্ম্মঠ স্বামীর সহিত ভ্রাতাদের গলগ্রহ হওয়ার দুঃখ ততোধিক; এ সম্বন্ধে সদাসর্ব্বদাই তাহাকে নিশ্চিন্ত স্বামীকে সচেতন করিতে হইত। সুদিনে সরকার-কোম্পানী মফস্বলের জমিদারদিগকে অলঙ্কার সরবরাহ করিতেন; সেই সূত্রে অনেকের সহিত রামদাসের পরিচয় ছিল। প্রায় দুইটি বৎসর ধরিয়া ঘুরাঘুরির পর রামদাস বাবু পুরুষোত্তমনারায়ণকে ধরিয়া এই চাকরীটি বাগাইয়া লয়। স্ত্রীকন্যাদের শ্বশুরালয়ে রাখিয়া রামদাস জমিদার-সরকারে, তিনটি বৎসর সংস্পৃষ্ট থাকিয়া, কাযটি পাকা বুঝিয়া, অবশেষে এই [illegible] পত্নী দুর্গাকে কর্ম্মস্থানে আনিয়াছে। কন্যাটি সাবিত্রী-বিদ্যালয়ে পড়ে; তাহার পরীক্ষা আসন্ন, সেই জন্য মায়ের সঙ্গে আসে নাই। পরীক্ষার পরই এখানে আসিবে ও এখানকার মেয়ে-স্কুলে পড়িবে, ইহাই সাব্যস্ত হইয়াছে।

৪

ছোট সংসারটির ভার লইয়াই দুর্গা স্বামীকে জানাইল,—ভারী দিয়ে জলের ব্যবস্থাটি শুধু ক'রে দিও, আর কোনও ব্যবস্থাই তোমাকে করতে হবে না।

রামদাস প্রশ্ন করিল,—ঠিকে ঝি একজন দরকার হবে না?

স্বাভাবিক কণ্ঠেই দুর্গা উত্তর দিল,—না!

স্বামীর পুনরায় প্রশ্ন,—বাসন মাজা, বাটনা-বাটা, এ সব কায করবে কে?

হাসিমুখে পত্নী জানাইল,—শ্বশুরবাড়ী থেকে বিনি মাইনের যে ঝিটিকে সঙ্গে ক'রে এনেছ, সেই সব চালিয়ে নেবে।

কথাটা রামদাসের বুকে বাজিল; কহিল,—ও অভ্যাস ত কোন কালেই ছিল না তোমার, কষ্ট হবে না?

দুর্গা অবিচলিতভাবেই উত্তর দিল,—পরের চাকরী করা অভ্যাস তোমারও ত এর আগে ছিলনা, তুমি যদি অনভ্যাসে অভ্যস্ত হ'তে পার, আমি পারবনা কেন?

বড় বাড়ীর যে ঝি অবসরমত এ বাসায় ঠিকে-ঝিয়ের কাযকর্ম্ম করিয়া দিয়া উপরি উপায় করিত, দুর্গাকেই তাহার কায করিতে দেখিয়া মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল। প্রতিমা তাহার সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে বসিয়া রামদাসের বাসার খবর শুনিল; মুখখানি বিকৃত করিয়া সে মন্তব্য প্রকাশ করিল,—গরীবের ঘরের মেয়ে, ঝিয়ের কায নিজেরাই ক'রে এসেছে

বরাবর, ঝি রাখবে কোন্ মুখে ? কিন্তু একটা বিষয়ে প্রতিমার মনে বিষম খটকা লাগিল, ইহার পূর্ব্বে যে কোনও কর্ম্মচারীর বধূ এই বাসায় আসিয়া ঢুকিয়াছে, সে-ই সর্ব্বপ্রথম প্রতিমার সম্মুখে আসিয়া শ্রদ্ধাবনতশিরে আনুগত্য স্বীকার করিয়া গিয়াছে, কিন্তু রামদাসের বধূ এ বাড়ীতে আসিয়া গরীবিয়ানার পরিচয় দিয়াও এ পর্য্যন্ত তাহার সহিত মূলাকাত পর্য্যন্ত করিতে আসে নাই। বেতনভুক্ ভৃত্যস্থানীয় রামদাসের বধূর এ ধৃষ্টতা শুধু প্রতিমার ড্রয়িং-রুমে নয়, বড় বাড়ীর সকল মহলেই আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

রান্নার তোড়যোড়গুলি কাছে গুছাইয়া লইয়া দুর্গা সে দিন সবেমাত্র হেঁসেলে বসিয়াছে, এমন সময় বাহিরের রুদ্ধ দরজাটি সবেগে ঠেলিয়া প্রতিমার খাস পরিচারিকা মেনকা দুম্ দুম্ শব্দে রান্নাঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শব্দ শুনিয়াই দুর্গা ক্ষণিকের জন্য কটাহ হইতে দুই চক্ষু তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিল ; দেখিল, খুব চওড়া নক্সা-পাড়ের বাহার দেওয়া ফর্সা শাড়ী পরিয়া ত্রিশ বত্রিশ বছরের একটি কালো বর্ণের মেয়ে থিয়েটারের ঝিয়ের মত ভঙ্গীতে দরজার উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার প্রকোষ্ঠে পাক দেওয়া বালা, বাহুমূলে হাঙরমুখো তাগা, গলায় এক ছড়া বিছা-হার। গায়ের গহনাগুলির বাহার যাহাতে সহজেই দৃষ্টিপথে পড়ে, এমন ভাবে অঙ্গসৌষ্ঠব বিকাশ করিয়া মেনকা স্বরের ঝন্‌ঝনা তুলিয়া কহিল,—তুমিই বুঝি আমাদের সরকার মশায়ের বউ ?

মেনকার কথায় দুর্গার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে কহিল,—কি রকম মনে হয় ?

পূর্ব্ববৎ ঝঙ্কার দিয়া মেনকা কহিল,—হাঁ গো হাঁ, জানতে পেরেছি, ঘাসে ত আর মুখ দিয়ে চলি না ! তা দেখছি ত ঘরকন্না গুছিয়ে টুছিয়ে

নিয়েছ বেশ, কাযকৰ্ম্মও দেখছি নিন্দের নয়, কথাবার্ত্তাও ভাল; শুধু আক্কেল-বিবেচনার মাথাটিই খেয়ে ফেলেছ, বউমা!

মুখখানি ম্লান করিয়া দুর্গা কহিল,—সত্যিই আমার অন্যায় হয়েছে দিদি, মানুষের বাড়ী মানুষ এলে আগে তাকে বসতে আসন দিতে হয়; কিন্তু দেখতেই ত পাচ্ছ, একা মানুষ, একটু সরলেই আনাজগুলো সব ধ'রে পুড়ে যাবে। ঘরের কোণেই মাদুরখানা গুটোনো রয়েছে, পেতে নিয়ে বস না দিদি, আমি এখুনই—

বাধা দিয়া মেনকা কহিল,—থাক্, থাক্, তুমি তোমার কায কর বউমা, বসব ব'লে ত এখন আসিনি এখানে, আর, এ জন্যে খোঁটাও তোমাকে দিইনি বাছা; চিনতেও বোধ হয় পারনি আমাকে,—রাণীমার কাছ থেকেই আসছি তোমার খবর নিতে গো!

দুর্গা তাহার তরকারির দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া কহিল,—চিনতে তোমাকে না পারলেও, কোথা থেকে যে আসছ—তা তোমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি।

মেনকা তীক্ষ্ণস্বরে কহিল,—তা হ'লে ত বুদ্ধি তোমার পেটে পেটে দেখছি, বউমা। সব জেনেও দিব্যি নিশ্চিন্তি হয়েই আছ!

বিস্ফারিত দুটি চক্ষুতে প্রশ্ন তুলিয়া দুর্গা কহিল,—ও কথাগুলো কি দিদি আমাকেই বললে?

মেনকা জ্বলিয়া উঠিল, উগ্রভাবে কহিল,—নইলে কি ঘরের দেওয়ালকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছি? তুমি ত বেশ মেয়ে দেখছি! এ দিকে ত আঁটসাট খুব, ওদিকে ঘটে এতটুকু বুদ্ধিশুদ্ধি যদি আছে! গরীবের মেয়ে, এসেছ ভিন্‌দেশে সোয়ামীর ঘর করতে, ভাগ্যিগুণে বড় ঘরের আওতায় এসে পড়েছ, কোথায় আত্তি-মমতা জানিয়ে তেনাদের সো হবে, য়াবে-

আসবে, করবে-কম্মাবে,—সে সব চুলোয় গেল,—রাণীমার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত দেখাটি পর্য্যন্ত করনি!

এতক্ষণে দুর্গা এই মুখরা পরিচারিকাটির আগমনের হেতু উপলব্ধি করিতে পারিল। এ বাসায় আসা অবধি স্বামী তাহাকে বধূরাণীর সহিত দেখা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছে, কিন্তু সে তাহাতে সাড়া দেয় নাই; একে ত স্বামীর প্রভুর বাড়ীতে প্রসন্ন মনে সে বাসা পাতিতে পারে নাই, স্বামী এ সম্বন্ধে বারবার বুঝাইলেও, এ ভাবে আশ্রয়-প্রাপ্তি একটা গোপন ব্যথার মত তাহার মনটিকে সর্ব্বক্ষণই অস্বস্তিকর করিয়া রাখিয়াছে; এ অবস্থায় স্বামীর প্রভুপত্নীর সান্নিধ্যে গিয়া দাঁড়াইতে তাহার বিক্ষুব্ধ চিত্তটি কিছুতেই সায় দেয় নাই। কি পরিচয় লইয়া সে সেখানে মাথা তুলিয়া যাইবে এবং যাইবার কি উপলক্ষ বা আছে তাহার পক্ষে? কাযেই এ বিষয়ে সে এ পর্য্যন্ত উদাসীনই ছিল, বিশেষতঃ এই মূলাকাত-ব্যাপারটি যে তাহাদের জীবনযাত্রার অংশবিশেষ, তাহা সে কোনও দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। পরিচারিকাটির তীক্ষ্ণ কণ্ঠের রূঢ় মন্তব্য চাবুকের মত যেন তাহার পৃষ্ঠে পড়িয়া এই প্রথম তাহাকে এ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিল। এক মুহূর্ত্তে দুর্গার সুন্দর মুখখানির উপর যেন একটা কাল ছায়া পড়িল! মুখের মত কথা দুর্গার মুখে আসিয়া যোগাইলেও স্বামীর অসহায় অবস্থার কল্পনা সঙ্গে সঙ্গে যেন তাহার মুখখানি চাপিয়া ধরিল, পরক্ষণে কৃত্রিম মিনতির ভঙ্গীতে নিজের অপরাধ-ত্রুটি যেন স্বীকার করিয়াই সে কহিল,—কি করি দিদি, দেখতেই ত পাচ্ছ—একা সব দিক সাম্‌লে চলতে হচ্ছে; তাঁর সঙ্গে দেখা করা যে কত বড় সৌভাগ্যের কথা, তা কি আমি নিজে জানি না,—যাব বৈ কি, আর গিয়ে সামনে দাঁড়ালে, দোষ-ঘাট তিনি কিছুই নেবেন না, তা তুমি দেখে নিও।

মেনকা মুখখানা ঘুরাইয়া কহিল,—যাওয়া না যাওয়া তোমার ইচ্ছে, আমার কি বল না! তবে, অসৈরণ কিছু চোখে পড়লে সইতে পারি না, তাই ওপরপড়া হয়ে সবতাতেই ছুটে মরি! মুখে আগুন আমার!

যেমন দুম-দুম করিয়া আসিয়াছিল, তেমনই ভাবে ঘরখানি কাঁপাইয়া মেনকা চলিয়া গেল। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দুর্গা—যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, চাহিয়া রহিল। শিক্ষার অভিমান এতক্ষণে যেন তাহাকে সচকিত করিয়া তুলিল, মনে মনে তাহার প্রশ্ন উঠিল,—সে ত কোনও অপরাধ করে নাই, তবে এতটা স্পর্দ্ধায় একটা অশিক্ষিতা নারী তাহার সম্মুখে আসিয়া—তাহারই বাসায় অনধিকারপ্রবেশ করিয়া—এমন অপ্রিয় কথা শুনাইল কেন?

আহারে বসিয়া রামদাস সমস্তই শুনিল, তাহার মুখে বিরক্তির ছায়া পড়িল; রুক্ষস্বরে সে কহিল,—এই জন্যেই আগে বলেছিলুম দেখা করতে; কাঙ্গালের কথা বাসি হলেই মনে লাগে!

তখনও দুর্গার মন বিষাইয়া ছিল, সে-ও তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দিল,—এই সব ভেবেই কাঙ্গালকে গোড়া থেকে আলাদা বাসা করবার জন্য সাধাসাধি করা হয়েছিল।

রামদাস উষ্ণ হইয়া কহিল,—বাসার কি অপরাধ শুনি? আমার যদি আলাদা বাসা ভাড়া করবার ক্ষমতা না থাকে? আমি কি এখানে মাগ্‌না আছি মনে কর?

দুর্গা কঠিন হইয়া কহিল,—মাগ্‌নায় যদি না থাক এখানে, অন্যের সাধ্য কি—দেখা করতে যাইনি ব'লে বাড়ী বয়ে এসে দশ কথা শুনিয়ে দিয়ে যায়?

রামদাস কহিল,—এটা কল্‌কেতা সহর নয়, আর আমিও ইংরাজের

আফিসের চাকর নই যে বুড়ী ছোঁয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ। জমিদারী সরকারে কায করতে হ'লে—কর্ত্তা-গিন্নীর মন যুগিয়ে চল্‌তে হয়। কালেক্টার সাহেব সফরে এলে জমিদারকেও ছুটতে হয় হুজুরের মন যোগাতে; বউরাণী নিজে গিয়ে কালেক্টর-গিন্নীর খোসামোদ করেন। এটা হচ্ছে কায়দা, ভদ্রতা; জমিদারবাড়ীতে এসে বউরাণীর সঙ্গে দেখা না করাটাই হয়েছে তোমার পক্ষে অভদ্রতা। শুনেছি লেখাপড়া শিখেছ, ইংরাজীও নাকি পড়েছ, তোমাদের শিক্ষা কি এই কথা বলে?

উচ্ছ্বসিতস্বরে দুর্গা কহিল,—আমি যোড়হাত ক'রে তোমাকে মিনতি করছি,—শিক্ষার খোঁটা আমাকে দিও না, তুমি যা শুনেছ, ভুল; সে পাট অনেক দিন বিসর্জ্জন দিয়েছি, যা কিছু শিখেছিলুম—সব ভুলে গেছি। তুমি এই নিয়ে কেলেঙ্কারী ক'র না, যে ভুল আমি করেছি, আজই তার সংশোধন করব।

রামদাসের প্রকৃতি কোন দিনই উগ্র ছিল না, যদিও আজ হঠাৎ সে রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা অল্পকালের জন্য। কলহ নিবারণ করিবার ক্ষমতা ছিল দুর্গার অসাধারণ। তাহারই সময়োচিত আচরণে রামদাসের রাগ জল হইয়া গেল, কথার সুর মধুর করিয়া সে কহিল,—দেখ, যখন যেমন, তখন তেমন; মধোকে মধুসূদন বল্‌লেই সে যদি খুসী হয়, তা বল্‌তে কি ক্ষতি বল? নিজেদের কারবার যখন ছিল, বড় বড় যায়গায় ক্যান্‌ভাস্বারের কায আমাকেই করতে হ'ত, কাযেই বড় লোকের মন যুগিয়ে চলা—আমার গায়ে বাধে না। তুমি প্রফেসরের মেয়ে, পড়াশুনা করেছ, এ অভ্যেস নেই জানি; কিন্তু যখন হা-ঘরের হাতে পড়েছ, একটু নীচু না হ'লে ত চল্‌বে না, বিশেষ এখানে যখন উন্নতির আশা রয়েছে।

৫

প্রতিমা তাহার ঘরে খাটের উপর শুইয়াছিল; ঘুম এই মাত্র ভাঙিয়াছে, কিন্তু ঘুমের খোঁয়াড়ী এখনও কাটে নাই; মেনকা মাথার কাছে দাঁড়াইয়া পাখার বাতাস করিতেছে, অপর এক পরিচারিকা পায়ের দিকে দাঁড়াইয়া পা দুইখানি টিপিয়া দিতেছে। বেলা তখন তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, প্রতিমা আলস্যভরে শয্যা হইতে উঠি উঠি করিতেছে,—এমন সময় কক্ষের পর্দ্দা ঠেলিয়া দুর্গা আস্তে আস্তে সেখানে প্রবেশ করিল ও নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত দুটি যোড় করিয়া তুলিল।

প্রতিমার দৃষ্টি ছিল দ্বারের দিকে, দুর্গাকে প্রথম দেখিয়াই—কোনও বিশিষ্ট ঘরের মহিলা তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে ভাবিয়া, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

দুর্গার দিকে মেনকার দৃষ্টি পড়িতেই সে সঙ্গে সঙ্গে রাণীমার ভুলটুকু সংশোধন করিয়া সতর্ক করিয়া দিল,—কাকে দেখে উঠছেন রাণীমা, ও যে আমাদের সরকার মশায়ের বউ গো!—তাহার পর দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া দুর্গার উদ্দেশে কহিল,—রাণীমাকে দেখতে আসবার সময় বুঝি তোমার এত দিনে হল? তবু ভাল!

মুহূর্ত্তে প্রতিমার মুখখানা অন্ধকার হইয়া গেল! বাড়ীর সরকারের স্ত্রীকে দেখিয়া তাহাকে এমন করিয়া উঠিতে হইল! লজ্জায় তাহার মাথা যেন কাটা যাইতেছিল। অথচ, মেয়েটির চেহারা, সাজসজ্জা, আসিবার ভঙ্গী দেখিয়া কিছুতেই ভুল হইবার যো নাই যে, সে কোনও বড় ঘরের মেয়ে নয়! কিন্তু তাহার এমনি ধৃষ্টতা যে, এই প্রথম দেখা

করিতে আসিয়াই চেহারার চটকে প্রতিমাকে একেবারে অপ্রস্তুত করিয়া দিল। রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠিল।

দুর্গার কিন্তু কোনও দোষই ছিল না; কর্ত্রীর সন্ধানে আসিয়া সে শুনিল, তিনি তাঁহার শয়নকক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন। দুর্গা ফিরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু এক বৃদ্ধা পরিচারিকা তাহাকে যত্ন করিয়া উপরে লইয়া আসে, রাণীমার ঘর দেখাইয়া দিয়া জানায়,—পর্দ্দা ঠেলে তুমি মা ভেতরে যাও, রাণীমা এতক্ষণ উঠেছেন।—তাহার কথাতেই দুর্গা সংবাদ না দিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। আর তাহার বেশভূষায় এমন কোনও প্রাচুর্য্য ছিল না, যাহা জমিদার-বাড়ীর ত্রিশ টাকা বেতনের সরকারের স্ত্রীর পক্ষে একান্ত অশোভন ও বিসদৃশ। দুর্গা পরিয়া আসিয়াছিল মিলের একখানি ধোপদুরস্ত শাড়ী এবং তাহার নিজের হাতে তৈয়ারী সূচের কাযকরা একটি সুশ্রী ব্লাউস; কিন্তু শাড়ীর সুন্দর পাড়টির সহিত ব্লাউসের লেস্‌গুলি এমন সুন্দরভাবে খাপ খাইয়া গিয়াছিল ও কাপড়খানি এমন কায়দা করিয়া সে পরিয়াছিল যে, তাহার রুচির প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। সেই জন্যই প্রথম দর্শনে দুর্গাকে সহরের নবাগত সদরবালা বা অন্য কোনও পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রী মনে করিয়া প্রতিমা শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

মেনকার মুখে পরিচয় পাইয়া প্রতিমা নিজের ভুলটুকু সংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে মাথার বালিশটা টানিয়া লইয়া তাহাতে বাম হাতের কনুয়ের ভর দিয়া হেলিয়া বসিল, মুখখানা একেবারে অন্ধকার, ভিতরে রাগের জ্বালা, দুই চক্ষুর উপর তাচ্ছীল্যভরা বিরক্তির চিহ্ন।

প্রতিমার মনের অবস্থা বুঝিতে দুর্গার বিলম্ব হয় নাই। বুঝিল, কর্ত্রীকে সে প্রসন্ন করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না কোন দিন।

সুতরাং সাক্ষাৎপর্ব্ব তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া সরিয়া পড়িবার অভিপ্রায়ে সে অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে কহিল,—অসময়ে আপনাকে বিছানা থেকে তুলে হয় ত খুবই বিরক্ত করলুম,—কিন্তু নিজের দিক দিয়ে খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করলুম আপনাকে দেখে।

দুর্গার কথা শুনিয়া প্রতিমা সোজা হইয়া বসিল, দুই চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দুর্গার মুখের উপর ফেলিয়া প্রশ্ন করিল,—তুমি বুঝি কলকেতার মেয়ে?

হাঁ।

তাই কথা কইবার কায়দা বেশ জান!—লেখাপড়াও তা' হ'লে নিশ্চয়ই জান?

সামান্য।

তবু শুনি না—ক'দ্দূর পড়েছ!

বলবার মত কিছু নয়,—তবে বানান না করেই পড়তে পারি, আর—হিঁজিবিজি ক'রে একটু আধটু লিখতেও জানি, এই পর্য্যন্ত।

তোমার নামটি কি?

শ্রীমতী দুর্গাদাসী।

কলকেতার মেয়ে তুমি, নাম বলতে আগা-পাছায় শ্রীমতী আর দাসী জুড়ে দিলে?

বড় ঘরে হয় ত দেয় না, কিন্তু আমরা যে গরীব গেরস্ত, তাতে আবার কায়স্থের মেয়ে,—কাযেই নাম কেউ জিজ্ঞেসা করলে, শ্রীমতী দিয়ে আরম্ভ ক'রে দাসী বলেই শেষ করতে হয়।

তোমার বাপের বাড়ী কলকেতার কোন্‌খানে?

বাগবাজারে।

বাপ-মা আছে ?

না,—ভায়েরা আছেন।

বাপ কি করত ?

ছেলে পড়াতেন।

পরের ছেলেই বুঝি সারাজীবন ধ'রে পড়িয়ে গেছে, তোমাকে পড়াতে পারেনি ভাল ক'রে ?

অদৃষ্ট !

তা ঠিক, অদৃষ্টে না থাকলে লেখাপড়া হয় না ; আমার বাবা ছিলেন হাকিম, জেলায় জেলায় ঘুরেছেন, আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছি ; লেখাপড়া শেখাতে তিনিও কসুর করেননি, আমিও ছাড়িনি। লেখাপড়ার মর্ম্ম জেনেছিলুম বলেই না আজ এ অঞ্চলের মেয়েগুলোকে লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের কুসংস্কার সব দূর করবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছি।

এখানে এসেই আমি তা শুনেছি। এখানকার প্রতিমা-পাঠশালা আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি, আপনার নামেই বোধ হয় এই বিদ্যালয় ! বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীগুলোও নিশ্চয় আপনি পেয়েছেন ?

বললুম না, বাবা ছিলেন হাকিম ; আমাকে পাঠাবেন তিনি ইস্কুলে—আর দশ জন মেয়ের সঙ্গে মিশে পড়াশুনা করতে ! মাষ্টার মাইনে ক'রে রেখে তিনি আমাকে বরাবর পড়িয়েছেন। আমার লেখাপড়া সম্বন্ধে কোনও ত্রুটি তিনি করেননি।

তিনি ছিলেন হাকিম, কিসে তাঁর ত্রুটি হবে বলুন।

ছেলেমেয়ের শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক পিতা মাতার একান্ত কর্ত্তব্য। তোমার ছেলেপুলে ?

একটি মেয়ে, ন বছরে পড়েছে।

কিন্তু মেয়ের কথা ত শুনিনি, তুমি একাই এসেছ শুনলুম।

মেয়ে মামার বাড়ীতে আছে, সামনে পরীক্ষা কি না; পরীক্ষা হয়ে গেলেই এখানে আনবার ইচ্ছা আছে।

এলে, আমাদের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়ে দিয়ো, মাইনে লাগবে না, আমি ফ্রী ক'রে দেব।

আমরা ত আপনারই আশ্রিতা সর্ব্বপ্রকারেই। তা হ'লে এখন অনুমতি করুন, যাই—

আচ্ছা,—হাঁ, বিকেলের দিকে রোজ কিন্তু আসা চাই,—আর একটু না হয় দেরী করেই আসবে,—নীচের ড্রয়িং-রুমেই আমাকে পাবে।

ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া দুর্গা চলিয়া গেল। প্রতিমা আড়-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল,—মেয়েটি সোজা নয়, যাকে বলে—ঝানু।

মেনকা সায় দিয়া কহিল,—যা কইলেন রাণীমা, কল্‌কাতার মেয়ে—ওদের প্রেত্যয় কি?—ঘোমটার ভেতরে ওরা খ্যামটা নাচে!

রাণীমার তৎক্ষণাৎ হুকুম জারী হইয়া গেল,—ওর ওপর ভাল ক'রে নজর রাখবি।

৬

রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়া গেলে দুর্গা হাসিয়া কহিল,—তোমাদের রাণীমার সঙ্গে আজ বিকেলে যে মুলাকাত কর্‌তে গিয়েছিলুম।

ব্যগ্র উল্লাসে রামদাস প্রশ্ন করিল,—গিয়েছিলে? দেখা হ'ল? কি বল্‌লেন?

সে অনেক কথা, বলি-বলি ক'রে কথাটা তোমাকে বল্‌তেই ভুলে গিয়েছিলুম।

অন্যায় করেছ, আগেই তোমার বলা উচিত ছিল, এখন বল!

বল্‌লে কিন্তু খুসী হবে না।

কেন?

আমি কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে ভাল ধারণা নিয়ে আস্‌তে পারি নি!

সে আমি আগে থেকেই জানি। যাক্, কি মন্দ ধারণাটাই নিয়ে এসেছ, তাই শুনি!

তবে বলি শোন,—গিয়েই দেখি, খাটে শুয়ে আছেন তোমাদের রাণী, দু'জন দাসী খাটের দু'দিকে দাঁড়িয়ে সেবা করছে; আমি যেতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন, ভেবেছিলেন, হয় ত কোনও বড় লোকের বউ ভেট করতে এসেছে; কিন্তু যেই দাসী দিলে আমার পরিচয়, অমনি মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল; কথাবার্ত্তায়—আদবকায়দায়—ভাবভঙ্গীতে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি হাকিমের মেয়ে, জমিদারের বউ এবং খুব উঁচুদরের শিক্ষিতা, সুতরাং—

সে কথা মিছে নয়, এ তল্লাটে ওঁর মত লেখাপড়াজানা মেয়ে দুটি নেই; নিজে সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা পর্য্যন্ত দেন—এমন ক্ষমতা।

বল কি! তা হ'লে ত ওঁর ও-রকম অহঙ্কার হবারই কথা; তাই বুঝি আমাকে বসতে পর্য্যন্ত হুকুম করলেন না!

ওটা হচ্ছে জমিদারী কায়দা; প্রজা বা কর্ম্মচারী যত বড়ই মাতব্বর হোক, সামনে এলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তার পর,—আর কি কথা সব হ'ল?

এই,—কোথায় বাড়ী, বাবা কি করতেন, কত দূর প'ড়েছি, ওঁর বাবার মত আমার বাবা আমাকে বেশী দূর পড়ান নি কেন,—এমনি নানা কথা।

তা হ'লে প্রথম মুলাকাতে আলাপ-পরিচয়ই বেশ হয়েছে বল?

তা হয়েছে বৈ কি,—নইলে, আমি তোমাদের রাণীকে এক আঁচেই চিনতে পারি? তবে তিনি হচ্ছেন রাণী মানুষ, সরকার মশায়ের বউকে চেনা না-চেনা দুই তাঁর পক্ষে সমান।

শেষে আর কিছু বললেন?

হুকুম করলেন, রোজ বিকেলের দিকে একবার ক'রে যেন তাঁর দরবারে হাজির হই।

তোমার সব কথাই বাড়িয়ে বলা চিরকেলে স্বভাব! ঐ রকম করেই তিনি বলেছেন কি না! রোজ যেতে বলেছেন দেখা-সাক্ষাৎ করতে, তোমারই ভালোর জন্যে, একলাটি বাসায় প'ড়ে থাকো—তাই! তা যেয়ো, বাসায় যেন মান কাড়িয়ে ব'সে থেকো না।

তাই হবে; তুমিও এক কায ক'রো,—তোমার রাজাবাবুর দাওয়াই-খানা থেকে ডজনখানেক বাতের তেল আনিয়ে রেখো।

রামদাস বুঝিল, কি জন্য দুর্গা উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সুর নরম করিয়া সে কহিল,—এবার দেখা করতে গেলে, আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, বসবার আসন নিশ্চয়ই পাবে।

৭

পরদিন অপরাহ্ণে প্রতিমার ড্রয়িং-রুমে দুর্গার ডাক পড়িল। মেনকা ঝড়ের মত আসিয়া জানাইল,—রাণীমা ডাকছেন তোমাকে বউমা, শিগ্‌গীর এসো—

গা ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, প্রস্তুত হইয়াই দুর্গা ভাবিতেছিল, কি করিবে? প্রতিমার মজলিসে যাইতে তাহার মন কিছুতেই সাড়া দিতেছিল না, অথচ পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেন হাতছানি দিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল। এমন সময় মেনকা আসিয়া সব সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিল। কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া সে সহজসুরেই কহিল—চল।

নীচের সুসজ্জিত সুবৃহৎ হল-ঘরটি এখন প্রতিমার ড্রয়িং-রুম। বিলাতী কায়দায় টেবল, চেয়ার, সোফা, টিপয় প্রভৃতিতে সুচারুরূপে সজ্জিত। প্রতিমা একখানা সোফায় বসিয়া তাহার বক্তব্য বলিতেছিল এবং সন্নিহিত সোফাগুলিতে সমাসীনা আরও সাত আট জন মহিলা তাহার কথা শুনিতেছিল। প্রত্যেকেরই পরিচ্ছদ-পারিপাট্য ও অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য তাহাদের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রকাশ করিতেছিল।

দুর্গা ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, গৃহস্বামিনী ও ভদ্রমহিলাদের উদ্দেশে নমস্কার জানাইয়া কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। দুর্গাকে দেখিয়া মহিলারা পরস্পর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই প্রতিমা কক্ষের প্রান্তভাগে দ্বারের নিকটে রক্ষিত একখানা টুলের দিকে তর্জ্জনী তুলিয়া দুর্গাকে কহিল,—ব'স।

দুর্গার মনের বিতৃষ্ণা সলজ্জ হাসির আকারে মুখে ফুটিয়া উঠিল, সঙ্গে

সঙ্গে এমন সপ্রতিভভাবে সে টুলখানির উপর বসিল যে, সোফায় যে কয় জন মহিলা বসিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকেরই বিস্ময়-দৃষ্টি এই অপরিচিতা অসামান্যা মেয়েটির দিকে স্বতঃই আকৃষ্ট হইল। অনাড়ম্বর সুষ্ঠু পরিচ্ছদে আজও দুর্গাকে অতি চমৎকার মানাইয়াছিল,—তাহার আসিবার ভঙ্গী, বসিবার ধরণ, মুখের বিহসিত স্বাভাবিক ভাব এই কক্ষে সমবেত তাহারই প্রায় সমবয়সী মহিলাগুলির চিত্তে গভীর বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছিল।

প্রতিমা মনের ভাব গোপন করিয়া হাসিয়া কহিল,—আমাদের সেরেস্তার সরকারের ওয়াইফ্, এর নাম দুর্গা. কলকেতায় বাপের বাড়ী; যদিও লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি, কিন্তু এটিকেট বেশ শিখেছে;—হাজার হোক, কলকেতার মেয়ে ত!

প্রতিমার কথা শুনিয়া কক্ষের মেয়েরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল; বড়-ঘরোয়ানার মেয়ে কেউ নয় তা হ'লে,—সরকারের বউ,—সর্ব্বরক্ষা! বসিবার জন্য প্রতিমা যখন তাহাকে টুল দেখাইয়া দেয়, তখনই তাহাদের মনে সংশয় জাগিয়াছিল, সে সংশয় এতক্ষণে কাটিয়া যাওয়ায় তাহারা নিশ্চিন্ত হইল।

এক জন মুখটি মুচকাইয়া প্রশ্ন করিল,—এখানে থাকে কোথায়?

প্রতিমা উত্তর দিল,—আমাদেরই বাড়ীতে, ফ্যামিলি নিয়ে যে সব কর্ম্মচারী থাকতে চায়, তাদের জন্য আলাদা বাসা আছে যে।

দুর্গা কহিল,—আমাকে ডেকেছিলেন?

প্রতিমা কহিল,—হাঁ, আমাদের ইস্কুলে ভদ্রঘরের বয়স্থা মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য একটা আলাদা ব্যবস্থা হচ্ছে। এ সহরে এমন অনেক ভদ্রমহিলা আছে, যারা ছেলেপুলের মা, লেখাপড়া ভাল জানে না,

অথচ শিখতে চায়। তাদের জন্যে আমরা প্রতি রবিবার স্কুল করব। তোমাকেও তাতে যোগ দিতে হবে, সেই জন্যই ডেকেছিলুম।

দুর্গা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—আমাকে কি করতে হবে?

প্রতিমা একটু শ্লেষের সুরেই কহিল,—ইস্কুলে গিয়ে মেয়েরা যা করে, তাই করবে; অর্থাৎ লেখাপড়া করবে।

দুর্গা হাসিয়া কহিল,—ইস্কুলে গিয়ে কেঁচে গণ্ডুষ করবার মত বয়স ত আমার নেই,—পেটের মেয়েটির ওপরেই সে ভার চাপিয়ে যে অনেক দিন নিশ্চিন্ত হয়েছি।

প্রতিমা কহিল,—লেখাপড়া সব বয়সেই শেখা চলে; বিশেষ, এই ক্লাস খোলা হচ্ছে ধাড়ীদের জন্যই, কচি খুকীদের জন্য নয়।

দুর্গা পূর্ব্ববৎ হাসিয়াই উত্তর দিল,—ধাড়ীদের নিয়েই ত যত ভাবনা! সংসারে ঢুকে যারা হাতা-বেড়ী ধরতে শিখেছে, তা ছেড়ে ইস্কুলে গিয়ে হাতে-খড়ি দিয়ে যে তারা বেশী দূর এগুতে পারবে, তা মনে হয় না।

প্রতিমা স্বরটি কিছু রুক্ষ করিয়া কহিল,—হাতে খড়ি দেওয়াবার মত লোকের অভাব ইস্কুলে হবে না।

দুর্গা মৃদু হাসিয়া কহিল,—অবশ্য, আপনি যদি নিজে এ ভার হাতে নেন, তা হ'লে হয় ত সব ধাড়ীই ইস্কুলে নাম লেখাবে।

মুখখানা ভার করিয়া প্রতিমা প্রশ্ন করিল,—এ কথার মানে?

মুহূর্ত্তে দুর্গার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, বুঝিল, রহস্যচ্ছলে সে যাহা কহিয়াছে, প্রতিমা তাহা অন্যভাবে লইয়াছে!

প্রতিমার পার্শ্বে যে মহিলাটি বসিয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,

কথার পিঠে কথাটা বলেছে, মানেটা তলিয়ে বোঝেনি; এই জন্যই লেখাপড়া একটু ভাল করেই শেখা দরকার।

প্রতিমা গর্ব্বিতভাবেই কহিল,—দশ জনের উপকার হবে ব'লে এক জন বড়লোক খরচ ক'রে দীঘি কাটায়, পয়সা নিয়ে মজুররা তার মাটী কাটে,—যে কাটায়, সে ঝোড়া-কোদাল নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় না।

দুর্গা হাতদুটি যুক্ত করিয়া মিনতির সুরে কহিল,—আমাকে মাপ করবেন, নিজের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষা দেওয়াটা যে কুলীমজুরের কায, এ কথা আমার জানা ছিল না।

আর এক মহিলা কহিলেন,—শিক্ষা দেবার মত শিক্ষয়িত্রীর ত অভাব নেই, কাযেই ইনি যদি নিজে ও ভার না নেন, কায আটকাবে না। এখন তুমি ইস্কুলে যাচ্ছ কি-না, তাই বল।

হঠাৎ দরজার উপরে আলম্বিত সুদৃশ্য পরদাটি দুলিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একাধিক কণ্ঠে প্রশ্ন হইল,—আমরা আসতে পারি?

সকলেই দেখিল, সুবেশধারী কতিপয় তরুণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, মুখে তাহাদের উচ্ছ্বসিত হাসি। দুর্গা ভিন্ন এই দল কক্ষের আর সকলেরই পরিচিত ও শ্রদ্ধার পাত্র।

প্রতিমা শশব্যস্তে উঠিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইল,—আসুন, আসুন।

দুর্গা সেই মুহূর্তে টুল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তরুণদল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই সে প্রতিমার উদ্দেশে নীরবে নমস্কার জানাইয়াই এক রকম ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সকলেরই দৃষ্টি তখন তাহার দিকে।

প্রতিমা মুখখানি কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—ইডিয়ট্!

এক মহিলা সেই সুরে সুর দিয়া কহিল,—ইনি আবার ক্যালকেটিয়া!

তরুণদলের মুখপাত্রটি প্রশ্ন করিল,—ত্রস্তা কুরঙ্গীটি কে? মুখখানা নতুন বলেই মনে হ'ল।

প্রতিমা উত্তর দিল,—আমাদের সরকারে বউ!

তরুণটি সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ভঙ্গীতে কহিল,—বাইজোভ! গোবর-গাদায় পদ্মফুল!

৮

ইহার পর আরও দুইটি মাস কাটিয়া গিয়াছে এবং ইহার মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তনও হইয়াছে; কিন্তু দুর্গা সেই যে প্রতিমার ড্রয়িং-রুম হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, আর কোনও দিন সেখানে প্রবেশ করে নাই বা কেহ তাহাকে কোনও প্রকারে সেই ঘরে লইয়া যাইতে পারে নাই।

রামদাসও দুর্গাকে আর অনুরোধ করে না। কেন না, বউরাণীর প্রতি তাহার অসীম শ্রদ্ধা থাকিলেও, তাহার ড্রয়িং-রুমে সহরের এক শ্রেণীর যুবাদের আনাগোনা ও সাহিত্য আলোচনা সে মোটেই পছন্দ করিত না, খোদ কর্ত্তার অজ্ঞাতে সেরেস্তায়ও এ সম্বন্ধে কাণাঘুষার অভাব ছিল না। সুতরাং দুর্গা যখন পণ করিয়া বসিল, হয় বাসা বদল কর, নতুবা তোমাদের রাণীমার ড্রয়িং-রুমে আমার না-যাওয়া মঞ্জুর কর, তখন তাহাকে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষোক্ত পথই অবলম্বন করিতে হইল। রামদাস মন্তব্য প্রকাশ করিল,—এ ক্ষেত্রে ওঁর ওখানে তোমার না যাওয়াই ভাল।

কিন্তু প্রতিমার পক্ষ হইতে দুর্গাকে যাইবার জন্য তলপের উপর তলপ আসিতে লাগিল। সকল দিক বাঁচাইতে দুর্গাও ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বসিল,—জানাইল,—শূলবেদনা তাহাকে কাবু করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং এ অবস্থায় স্কুলে বিদ্যাচর্চ্চা তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। ইতোমধ্যে দুর্গার মেয়েটি এখানে আসিয়া পড়িল, অগত্যা তাহাকেই প্রতিমা-পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিয়া দুর্গা কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইল।

দুর্গার প্রতি প্রতিমার যত কিছু কোপ—সমস্তই রামদাসের উপর

গিয়া পড়িল। নানা দিক দিয়া নানা ভাবে বিপন্ন হইয়া রামদাস বুঝিল, সে রাণীর কোপে পড়িয়াছে, আর তাহার নিস্তার নাই।

দুর্গা স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল,—বিপদ আসিলে ধৈর্য্য অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কায, কেন ভয় পাও? তুমি তিন বৎসর এখানে কায করেও কর্ত্তা গৃহিণী কারও প্রকৃতির পরিচয় পাও নি, আমি এই কটি মাসেই ওদের চিনেছি। এখন আমি যা বলি, সেই মত কায কর।

দুর্গার পরামর্শমত রামদাস এক দিন কর্ত্তা পুরুষোত্তম নারায়ণকে গোপনে সব কথা শুনাইয়া দিল। কর্ত্তারও অন্তঃপুরে চরের অভাব ছিল না, দুর্গা-প্রতিমা-সংবাদ তিনি পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রামদাসের কথার সহিত সে সংবাদ হুবহু মিলিয়া গেল। তিনি রামদাসকে অভয় দিয়া কহিলেন,—তোমার কোনও চিন্তা নেই, কেউ তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না, তোমার স্ত্রী যে রাণীর দলে ভিড়ে যান নি, এতে আমি খুব খুসী হয়েছি,—তাঁর সাহসকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। তোমার স্ত্রীকে বলবে, তিনি যেন ঠিক থাকেন, রাণীর রাজত্ব বেশী দিন টেকবে না—এ কথাও যেন মনে ঠিক দিয়ে রাখেন।

আজ প্রতিমা-পাঠশালার দ্বিতীয় বার্ষিকোৎসব। সারা সহরে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, বড় বাড়ীতেও তাহার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। প্রতিমার শুভানুধ্যায়িনী বন্ধুরা সাজসজ্জার বাহার খুলিয়া বিদ্যামন্দির আলো করিয়া বসিয়াছেন। দলে দলে নিমন্ত্রিতা মহিলাগণ সভামণ্ডপে প্রবেশ করিতেছেন। নবাগত ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিষ্টার রায়ের বিদুষী পত্নী মিসেস রায় সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিবেন, নিমন্ত্রণপত্রে ও সহরের সর্ব্বত্র ইহা ঘোষিত হইয়াছে। সদরালা-পত্নী মিসেস চক্রবর্ত্তীও সভায় উপস্থিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে

প্রতিশ্রুতা হইয়াছেন। মূল্যবান্ সুদৃশ্য কার্পেট-মণ্ডিত পাটাতনের উপর তাঁহাদের জন্য দুইখানি মহার্ঘ্য আসন রক্ষিত,—পাটাতনের নিম্নেই দক্ষিণে গণ্যমান্য বিশিষ্ট মহিলাগণের আসন, বামে পাঠশালার সাধারণ ছাত্রীগণের অভিভাবিকাদের স্থান নির্ব্বাচিত। ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণ সারিবদ্ধ হইয়া দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে। সকলেই সাগ্রহে সভানেত্রীর প্রতীক্ষায় উন্মুখ।

ঠিক তিন ঘটিকায় সভা আরম্ভ হইবার কথা। তিনটা বাজিবার দশ মিনিট পূর্ব্বে পাঠশালার দ্বারে ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নীর মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। প্রতিমা ও তাহার বন্ধুগণ সসম্ভ্রমে মিসেস রায়কে অভ্যর্থনা করিয়া সভা-মণ্ডপে লইয়া আসিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নীর পরিচ্ছদে কোনও আড়ম্বর দেখা গেল না, সাদা-সিধা সুশ্রী পরিচ্ছদ, অলঙ্কারেরও কোন প্রাচুর্য্য নাই, কিন্তু এই সাধারণ পরিচ্ছদ পরিধানের পারিপাট্য ছিল অসাধারণ; প্রতিমার মনে সহসা ভাসিয়া উঠিল দুর্গার স্মৃতি, না, তাহারও জামাকাপড় পরিবার ধরণটি ছিল এমনই চমৎকার!

মিসেস রায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিতেই প্রতিমা স্বহস্তে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিল; ছাত্রীগণ সমবেত কণ্ঠে একটি স্তুতি-গীত গাহিয়া সভার উদ্বোধন করিল। পাঠশালার প্রতিষ্ঠাত্রী প্রতিমা সেনের গুণরাজি ও সভানেত্রী-রূপের আদর্শ বিদুষী মিসেস রায়ের সুখ্যাতি প্রসঙ্গেই গানখানি বিশেষভাবে রচিত হইয়াছিল। আত্ম-প্রশংসায় লজ্জা পাইয়া মিসেস রায়কে অবনতমুখী দেখা গেল, কিন্তু প্রতিমার মুখে আত্মপ্রসাদের উজ্জ্বল আভা ফুটিয়া উঠিল।

গানের পর আট বছরের একটি মেয়ে আধুনিক অভিনয়ের অনুকরণে পদ্যকে গদ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথের "বন্দী বীর" আবৃত্তি করিল। তাহার

পরবর্ত্তী মেয়েটি একখানা হাসির গান গাহিয়া সকলকে হাসাইয়া দিল।

ইহার পরেই নয় দশ বছরের অপূর্ব্ব সুন্দরী একটি মেয়ে কীর্ত্তনের সুরে যে ভাবময় গানখানি গাহিল, তাহা শুনিয়া সকলেই যেন একসঙ্গে অভিভূত হইয়া পড়িল; মিসেস রায় তন্ময় হইয়া গানখানি শুনিতেছিলেন, তাঁহার মুখেচোখে বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়া উঠিল। গান শেষ হইতেই তিনি প্রতিমাকে প্রশ্ন করিলেন,—এ গানখানি আপনারা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন?

প্রতিমা জানিত না, প্রধান শিক্ষয়িত্রীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেই তাহার নিকট হইতে উত্তর আসিল,—যে মেয়েটি গান গেয়েছে, তার মুখেই এক দিন এই গানখানা শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই, আর সকলেই আমার মত মুগ্ধ হবেন মনে করেই আজকের উৎসবের প্রোগ্রামে ওকে দিয়েই ঐ গানখানি শোনাবার ব্যবস্থা করি।

মিসেস রায় মেয়েটিকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি এ গান কার কাছে শিখেছ, খুকী?

অতি মধুর স্বরে মেয়েটি উত্তর দিল,—মা'র কাছে।

প্রতিমা তাহার দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—তোমার মায়ের কি নাম খুকী?

মেয়েটি সুন্দর মুখখানি নত করিল মাত্র, কোনও উত্তর দিল না।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া মিসেস রায় কহিলেন,—লজ্জা হচ্ছে বুঝি? আচ্ছা তোমার মায়ের নাম কি ছুর্গা?

মেয়েটি ঘাড়টি হেলাইয়া সম্মতিসূচক ভঙ্গীতে কহিল,—হাঁ।

মিসেস রায় বিস্ময়ের সুরে কহিলেন,—এই গানখানি যাঁর রচনা,

ক্লাসের্ড নাম দুর্গা; আমি তাঁকে জানি, আমরা একসঙ্গে একই কলেজে পড়েছি, দু'জনে একই ইয়ারে বি, এ পরীক্ষা দিই; আমি ফেল হই, সে পাশ করে।

প্রতিমা হাসিয়া কহিল,—আপনি যাঁর কথা বলছেন, এ সে দুর্গা নয়।

মিসেস রায় প্রতিমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া মেয়েটিকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলেন,—তোমার মা এখানে আসে নি, খুকী?

ঘাড় নাড়িয়া খুকী জানাইল,—না।

তোমার মুখখানি দেখে যে আমার ভারি ধোঁকা লাগছে। আচ্ছা, তোমার মামার বাড়ী কোথায়?

কলকেতায়।

কলকেতার কোন্‌খানে, খুকী?

বাগবাজারে।

বাগবাজারে! তোমার মা'র বাবার নাম বলতে পার?

পারি,—৺নৃত্যলাল নন্দী।

প্রফেসর এন, নন্দীর তুমি নাতনী তা হ'লে?

হাঁ, দাদুর কথা উঠলেই সবাই ওঁর নাম বলে, আমি ত তাঁকে দেখি নি।

বিপুল পুলকে খুকীকে কোলের উপর বসাইয়া লইয়া মিসেস রায় সোচ্ছ্বাসে কহিলেন,—তা হ'লে আমি ভুল করিনি, তুই আমার সেই দুর্গারই মেয়ে!—মিসেস রায়ের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল, চক্ষুর কোণে অশ্রুর সঞ্চার হইল।

সভাস্থ সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত, কাহারও মুখে কথা নাই; মিসেস রায় নিজেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। গাঢ়স্বরে কহিলেন,—আমাকে এতটা বিচলিত হ'তে দেখে আপনারা হয় ত বিস্মিত হচ্ছেন, কিন্তু আমি বোধ হয় আরো বেশী বিস্মিত হচ্ছি এই ভেবে যে, শিক্ষা-সংক্রান্ত এই প্রতিষ্ঠানটি আপনারা গ'ড়ে তুলেছেন—এই মেয়েটির মাকে বাদ দিয়ে! এই সভায়ও তার ডাক পড়ে নি, অথচ আমি জানি, কলেজে সবার আগে ছিল তার স্থান, উচ্চশিক্ষা কোনো দিন তার মনে কিছুমাত্র অহমিকা জাগায় নি, সত্যকার শিক্ষাই সে পেয়েছিল; আমার মনে হয়, এই সভায় হয় ত তার মত উচ্চশিক্ষিতা আর কেউ নেই।

প্রত্যেকেই মুখ নত করিল, মুখ তুলিয়া মিসেস রায়ের প্রশ্নের উত্তর দিবার মত সাহস বা সামর্থ্য কাহারো ছিল না। পাঠশালার প্রধানা শিক্ষয়িত্রী যিনি—তিনিও গ্র্যাজুয়েট নহেন, আই, এ ফেল!

প্রতিমার মনে হইতেছিল, ধরণী যদি এই মুহূর্ত্তে দ্বিধা হয়, তাহা হইলে সে অসঙ্কোচে ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া মুখ রক্ষা করে! নিজের হাতে যে তরুর বীজ সে বপন করিয়াছিল, তাহাই আজ বিষ-তরুতে পরিণত হইয়া তাহাকেই অপমান-বিষে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে! তাহারই প্রতিষ্ঠিত পাঠশালার উৎসব-সভায় সর্ব্বসমক্ষে আজ তাহার এই অপ্রত্যাশিত লাঞ্ছনা! যে দুর্গা তাহার আশ্রিতা, যাহার মার্জ্জিত রুচির তীক্ষ্ণতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া প্রতিবিধিৎসায় সে সদা তৎপর, অশিক্ষিতা ভাবিয়া যাহাকে এক দিন সে এই পাঠশালার বিশেষ ক্লাসে শিক্ষা লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছে, আজ শুনিতেছে, সে বিখ্যাত অধ্যাপক এন, নন্দীর কন্যা, নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট!

অতঃপর [illegible] করিয়া সে তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে, মুখ দেখাইবে, কথা কহিবে তাহার সঙ্গে !

প্রতিমার শিক্ষাভিমানিনী বান্ধবীদের মনেও যুগপৎ এই চিন্তা, দুর্গার প্রতি তাহাদের এক দিনের আচরণ স্মরণ করিয়া তাহারা পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করিল ; কেঁচো খুঁড়িতে হঠাৎ যে এ ভাবে সাপ বাহির হইবে, কেহই এ কল্পনা করে নাই।

মিসেস রায় কহিলেন,—আপনারা যে ভুল করেছেন, আমি তার সংশোধন করতে চাই—দুর্গাকে এ সভায় আনিয়ে। আশা করি, এতে আপনাদের মনে কোনও আপত্তি নেই !

প্রতিমাই উত্তর দিল,—আপনার ইচ্ছার ওপর আমাদের কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না। কিন্তু আপনার এ চেষ্টা বৃথা।

বিস্ময়ের সুরে মিসেস রায় প্রশ্ন করিলেন,—কেন ?

প্রতিমা মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল,—তিনি যেমন তাঁর বিদ্যার কথা আমাদের কাছে গোপন রেখেছেন, সব অনুষ্ঠানের সংস্রব থেকেও তেমনি নির্লিপ্ত আছেন। কাযেই এ সভায় যে আসবেন, তা মনে হয় না।

দৃঢ়স্বরে মিসেস রায় কহিলেন,—সে ভার আমার।

পরক্ষণেই তিনি তাঁহার আয়াকে ডাকিয়া পাঠশালার নাম ছাপা কাগজে কয় ছত্র কি লিখিলেন, তাহার পর সেখানি আয়ার হাতে দিয়া প্রতিমার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—এর সঙ্গে আপনাদের কমিটির কাউকে পাঠান।

প্রতিমার কথায় তাঁহারই এক বান্ধবী উঠিলেন। ইনিই এক দিন দুর্গাকে ভালো করিয়া লেখাপড়া না শিখিবার খোঁটা দিয়াছিলেন !

মিসেস রায় আয়াকে ডাকিয়া কহিলেন,—আমার গাড়ী নিয়ে যাও।

প্রতিমা তাড়াতাড়ি কহিল,—আমাদের গাড়ী ত বাইরে রয়েছে।

মিসেস্ রায় হাসিয়া কহিলেন,—থাক্, নিমন্ত্রণটা বিশেষভাবে আমার কি না, কাযেই আমার গাড়ীখানারই যাওয়া দরকার।—এখন আমাদের সভার কায চলুক।

প্রতিমা তখন সভানেত্রীর অনুমতি লইয়া তাহার সুবৃহৎ অভিভাষণ পাঠ করিতে উঠিল।

৯

অভিভাষণ পাঠ শেষ করিয়া প্রতিমা আসন গ্রহণ করিতেই, সকলেই করতালি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। ঠিক এই সময়—সভায় দুর্গার প্রবেশ।

দুর্গাকে দেখিয়াই মিসেস রায় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন, সভানেত্রীর সঙ্গে সঙ্গে সভার সকলকেই আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইতে হইল।

পাটাতনের নিকটে আসিয়া দুর্গা দাঁড়াইতেই মিসেস রায় উন্মত্ত উল্লাসে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া পাটাতনের উপরে লইয়া গেলেন। তাঁহার আসনের পার্শ্বে-ই ছিল সদরালার পত্নীর জন্য একখানি বিশেষ আসন, তিনি না আসায় আসনটি খালি ছিল। মিসেস রায় দুর্গাকে জোর করিয়া সেই আসনে বসাইয়া দিলেন। টেবলের উপর সদরালা-পত্নীর জন্য আর এক ছড়া ফুলের মালা একখানি রূপার আধারে রাখা ছিল, নিজে তাহা তুলিয়া দুর্গার গলায় পরাইয়া দিলেন। উল্লাসে প্রায় সকল আমন্ত্রিতা মহিলাই একসঙ্গে করতালি-সংযোগে দুর্গার এই সম্বর্দ্ধনার সমর্থন করিলেন।

মিসেস রায় কহিলেন,—রহস্যটুকু আগে প্রকাশ হ'লে, তোমাকেই আমরা বসাতুম—সভানেত্রীর আসনে; কেন না, এ সভায় তুমিই হচ্ছ বিদ্যায় সকলের সিনিয়ার।

দুর্গা হাসিয়া উত্তর দিল—বিদ্যের খবর আমার লুকানো ছিল এতদিন, কেউ জানেনি, স্বামী পর্য্যন্ত না; কে জানতো বল, কালেক্টর-গিন্নী হয়ে এখানে এসেই তুমি করবে এ ভাবে গোয়েন্দাগিরি!

মিসেস্ রায় কহিলেন,—তোমার বাঁধা গানই যে ধরিয়ে দিলে তোমাকে,—তার ওপর তোমার মেয়ের মুখখানাও মনে কম ধোঁকা দেয়নি ; ছাঁচ যে একই রকমের। আচ্ছা, এখন সভার বাকি কাযটুকু শেষ করা যাক্, তার পর—আর সব কথা হবে।

অতঃপর সভানেত্রীর অভিভাষণের পালা। তিনি বক্তৃতা দিতে উঠিয়া—প্রতিমা-পাঠশালার বার্ষিকোৎসবে সভানেত্রীত্বের সুযোগে একখানি গানের ভিতর দিয়া যে দুর্লভ রত্নটির আবিষ্কার করিয়াছেন — উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাহার উল্লেখ করিয়া শেষে এই বলিয়া তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করিলেন,—যে জন্য আপনাদের এই সভা, যে জন্য আমাকে এখানে আপনারা নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন, সে সম্বন্ধে নূতন কিছু তথ্য প্রকাশ করার যোগ্যতা আমার সামান্য,—এ বিষয়ে আমি যাঁকে অসামান্য মনে করি, আমার সেই প্রিয় বান্ধবী, সংগোপনে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুজ্জ্বল রত্ন শ্রীমতী দুর্গার ওপরই আমি সেই ভারটুকু চাপাচ্ছি। তিনিই আপনাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ ক'রে তুষ্ট করবেন।

মিসেস রায়ের অভিভাষণের উত্তরে দুর্গাকেও উঠিয়া পাল্টা জবাব দিতে হইল। মিসেস রায়ও রেহাই পাইলেন না। নিজেকে যতদূর সম্ভব লঘু করিয়া—মানুষের দেওয়া উপাধি-গৌরবকে উপেক্ষা করিয়া—বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মেয়েদের প্রাক্তনলব্ধ শিক্ষাশক্তির বৈশিষ্ট্য বিবিধ যুক্তির সহিত প্রকাশ করিয়া দুর্গা সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দিল।

দুর্গার কথায় সভার সকলে জানিবার অবকাশ পাইল যে, উচ্চ শিক্ষার মোহ কিছুতেই তাহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা সংসারকেই সে কঠিন শিক্ষাস্থল বলিয়া মনে করে। অতঃপর সে যখন গাঢ়স্বরে শুনাইল,—প্রত্যেক নারীর কর্ত্তব্য মনের উপর

প্রভাব বিস্তার করা, কেন না, মনেরই পরিবর্ত্তন হয় সামান্য ঝঞ্ঝায়। সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করতে এই মন, আবার শিব সত্য সুন্দরের পূজা ক'রে আদর্শ জায়া ভগিনী জননী হবার মূলেও এই মন। মোহ কাটাতে হ'ল মনকে সবল করা চাই, স্ত্রীজাতির শিক্ষার এই প্রথম সোপান। উপসংহারে সে উচ্ছ্বসিত ভাষায় আত্মবিস্মৃতা নারীজাতিকে আত্মস্থ ও আত্মপ্রত্যয়ী হইবার সন্ধানটুকুরও নির্দ্দেশ দিল,—আমরা মা, ভগবতী আমাদের অন্তর জুড়ে আছেন ; আমাদের মন যখন মুসড়ে পড়ে, নিস্তেজ হয়, বিশ্বাস হারাই, তিনিও সেই সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েন ; কিন্তু মনে শক্তি এলে, মন সংযত হলে, শুদ্ধ থাকলে—তিনি বেশীক্ষণ ঘুমিয়ে থাকতে পারেন না, তখনই আমাদের মনোরাজ্যে হয় ভগবতীর জাগরণ।

দুর্গার বক্তৃতায় এই শিক্ষালয়ের শিক্ষা-নীতি পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সকলেই সমস্বরে তাহার প্রশংসা করিল।

সভা ভাঙিলে দুর্গা কিন্তু মুক্তি পাইল না, সকন্যা তাহাকে মিসেস রায়ের বাংলোয় যাইতে হইল। অনতিবিলম্বে তাহার সৌভাগ্যের কথা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। জমিদারী সেরেস্তার সরকার রামদাস সরকারের স্ত্রী যে বি, এ পাশ করা মেয়ে, তাহার উপর কালেক্টর বাহাদুরের স্ত্রীর সহিত তাহার এত মাখামাখি,—এ কাহিনী অনেকেরই চিত্তে শিহরণ তুলিল।

প্রতিমা বাড়ী ফিরিয়াই তাহার ড্রয়িং-রুমের দরজায় তালা লাগাইবার আদেশ দিল। মেনকাকে বলিয়া রাখিল,—কাউকে যেন এ ঘরে বসানো না হয়, মেয়েরা কিম্বা বাবুরা এলে বলবি, রাণীমার শরীর ভাল নয়, এ ঘরে আর বৈঠক বসবে না।

সন্ধ্যার পর মিসেস রায় নিজে সঙ্গে আসিয়া দুর্গা ও তাহার কন্যাকে

বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। কালেক্টরের মোটর বড়বাড়ীর দেউড়ীতে লাগিতেই, সকলে তটস্থ; উর্দ্দীপরা সোফারের পার্শ্বে কালেক্টরের তকমাধারী চাপরাসী। সেরেস্তার কর্ম্মচারিগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখিল, কালেক্টর-পত্নী রামদাসের স্ত্রী ও কন্যাকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া মোটরে উঠিলেন। আসিতে যাইতে দুইবারই তাহাদিগকে মস্তক নত করিয়া সেলাম বাজাইতে হইয়াছিল।

যথাসময়ে রামদাস আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া বাসায় প্রবেশ করিল। সন্তর্পণে জুতা-যোড়াটি খুলিয়া রাখিয়া রান্নাঘরের দরজাটির সম্মুখে গিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইল। দুর্গা তখন উনানে হাঁড়ি চাপাইয়াছে, কন্যা কাছে বসিয়া যোগাড় দিতেছে। দ্বারের দিকে সহসা দৃষ্টি পড়িতেই দুর্গা চমকিয়া উঠিল, পরক্ষণে আত্মসম্বরণ করিয়া মুখে সলজ্জ হাসি আনিয়া কহিল,—কি হ'ল! অমন ক'রে যে দাঁড়িয়ে!

রামদাস শুষ্ক কণ্ঠে কহিল,—আমি শুনেছি সব।

তাই বুঝি চোরটির মত এসে দোরটির ওপর দাঁড়িয়েছ খবরদারি করতে?

তা কেন, সুখবর দিতে; তোমার নামে সহরময় যে ধন্যি ধন্যি পড়েছে।

তবেই আমি চতুর্ভুজ হলুম আর কি!

রামদাস গর্ব্বের সুরে কহিল,—তুমি কেন, চতুর্ভুজ হয়েছি আমি! লেখাপড়া শিখেছো, জানতুম, তার মানে বিদ্যের দৌড় তোমার বড় জোর ফোর্থ ক্লাস! ও বাবা, এখন শুনছি, ধুকড়ির ভেতর খাসা চাল! বিদ্যের জাহাজ! একেবারে গ্র্যাজুয়েট! কিন্তু একটি দিনের জন্যও টের পেতে দাওনি, বিদ্যের বড়াই কখনো করনি, এই জন্যই না দেশশুদ্ধ সবাই ধন্য ধন্য করছে! আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না—ধন্য কে?

জাগ্রতা ভগবতী

দশভুজা

চার

১

ভবানীপ্রসাদের মৃত্যুতে তাঁহার মুষ্টিমেয় পরিজন যে পরিমাণে কাঁদিয়াছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ জ্ঞাতি-প্রতিবাসিগণ সেই অনুপাতে বেশ রকমেই হাসিয়াছিল। ইহার মূলতত্ত্ব অন্বেষণ করিলে, প্রভাবশালী বয়োজ্যেষ্ঠের তিরোধান কি সূত্রে বিশাল জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর প্রীতিপদ হইয়াছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘোষপাড়া বিখ্যাত গণ্ডগ্রাম। নবাবী আমল হইতে এই গ্রাম ও গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা ঘোষবংশ প্রতিষ্ঠান্বিত। এক সময়ে এ অঞ্চলে ইহাদের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যের অন্ত ছিল না; কিন্তু কালক্রমে বংশের সহিত বিশাল জমিদারী বহুধা বিভক্ত হওয়ায়, পূর্ব্ব-পুরুষদের অতীত গৌরবের বিচ্ছন্ন কাহিনীর সহিত যোগসূত্রটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বর্ত্তমানের বংশধরগণ কোনও প্রকারে আভিজাত্যের বুড়িটি আঁকড়াইয়া দিন কাটাইতেছিলেন। গ্রামখানির অধিকাংশই অধিকার করিয়া এই মহাবংশের অবতংসেরা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিলেও, জমিদারীর উপস্বত্বটুকু প্রায় অর্দ্ধ শত সরিকের মধ্যে যেরূপ হারে বিতরিত হইতে থাকে, তাহাতে ইদানীং জমিদার-বংশধরদের বংশগত সম্ভ্রমটুকু রক্ষা করা ত দূরের কথা, জীবিকার ব্যবস্থাটাও রীতিমত সমস্যা তুলিয়াছিল।

কিন্তু এ অবস্থাতেও দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে পুরুষানুক্রমে এই বংশের দুর্গোৎসব প্রতিবৎসর বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হইত।

পূর্ব্বপুরুষদের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থায় এই সম্পত্তি এ পর্য্যন্ত বংশধরদের লোলুপদৃষ্টি অতিক্রম করিয়া অক্ষত অবস্থাতেই ছিল। বংশের দুলালদের বুদ্ধির দোষে ও ভাগ্যবশে দশাবিপর্য্যয় ঘটিলেও, দেবোত্তর সম্পত্তির সুপ্রচুর আয়ে দেবসেবায় কোনরূপ অসদ্ভাব দেখা দেয় নাই। ঘোষপাড়ার দুর্গোৎসব আবহমানকাল হইতে এ অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতার অতি-পরিচিত সার্ব্বজনীন পর্ব্ব; বিভিন্ন গ্রাম হইতে দলে দলে সকলে প্রতিমা দেখিতে আসে, সমাগত সকলেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইয়া থাকে। আহূত অনাহূত সর্ব্বসাধারণকে জগদম্বার প্রসাদে পরিতৃপ্ত করিবার প্রথা স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল এবং নির্ব্বিচারে এই ভোজন ব্যবস্থাই ছিল ঘোষপাড়ার দুর্গোৎসবের বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু বিশ্বব্যাপী আর্থিক সমস্যায় অভাবের ক্ষুধা জমিদার-বংশধরগণকে যখন বিব্রত করিয়া তুলে, তাঁহাদের প্রখর দৃষ্টি তখন বিষয়ান্তরে না ঝুঁকিয়া, এই পরিপুষ্ট দেবোত্তর তরুটির ডাল ভাঙিয়া, পাতা ছিঁড়িয়া, গুঁড়ি চিরিয়া রস আহরণ করিতে উদগ্র হইয়া উঠে। দুর্গোৎসবে বিপুল ব্যয়বাহুল্য তথাকথিত বংশধরদের বরদাস্ত হইতেছিল না এবং পূর্ব্ববর্ত্তীদের যিনি বিগ্রহের অর্চ্চনাসূত্রে বংশধরদের নিগ্রহের এইরূপ অসমীচীন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিচারবুদ্ধি প্রসঙ্গেও সমালোচনার অন্ত ছিল না। বার্ষিক প্রায় দুই সহস্র টাকা যে সম্পত্তির মুনফা, সে সমস্তই একটা পূজার উৎসবে নিঃশেষ হইয়া যায়!—অথচ, তাহাদের নিত্য অভাব; এই সম্পত্তির মালিক হইয়াও তাহারা প্রতিবৎসর এই ভাবে ভূতের ভোজ দেখে! আগে নিজেদের পেটের ব্যবস্থা, তারপরে—পাল-পার্ব্বণ, দেবতার পূজা, পরের সেবা।—ইচ্ছা করিলেই ত ইহার প্রতীকার সমবেত শক্তিতে তাহারা করিতে পারে!

কিন্তু বংশের জ্যেষ্ঠ ঘোষবংশের বর্ষীয়ান পুরুষসিংহ, দুর্গোৎসবের সেবাইত ভবানীপ্রসাদ সরিকদের এই 'ইচ্ছা' শুনিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিলেন,—খবরদার! বারদিগর যদি এমন কথা শুনি, জিভগুলো তোমাদের টেনে ছিঁড়ে দেব, যেন মনে থাকে।

এই অতিমানুষটির প্রভাব প্রতিপত্তি ও ব্যক্তিত্ব এমনই অসাধারণ ছিল যে, মনঃক্ষুণ্ণ সরিকগণ তাঁহার অসাক্ষাতে নানা প্রকার আস্ফালন এবং সেইসূত্রে দেবোত্তর সম্পত্তি আত্মসাতের বৈধ অবৈধ পরিকল্পনা চালনা করিলেও তর্জ্জনকারীর সম্মুখীন হইয়া কেহই আর এ সম্বন্ধে জিভটি নাড়িবার ভরসা পান নাই।

সুতরাং এ হেন জবরদস্ত সরিক ভবানীপ্রসাদের তিরোধানে স্বার্থসর্ব্বস্ব জ্ঞাতি প্রতিবাসীরা যে প্রাণ খুলিয়া হাসিবেন, তাহা এক্ষেত্রে অস্বাভাবিক নহে।

২

কিন্তু ভবানীপ্রসাদের শ্রাদ্ধ শান্তি চুকিয়া গেলে, সময় বুঝিয়া সরিকগণ তাঁহাদের স্বার্থ সাধনে পুনরায় মাথা তুলিতেই, তৎক্ষণাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রবল বাধা পাইলেন। স্তব্ধবিস্ময়ে তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের রক্ষণশীল জ্ঞাতি শত্রুটি পরলোক-পথে পাড়ি দিলেও, ইহলোকে সরিকদের স্বার্থসিদ্ধির পথটুকু নিরঙ্কুশ করিয়া যান নাই। লোকান্তরিত বৃদ্ধের চিররুগ্ন পুত্র দুর্গাপ্রসাদকে সরিকগণ অগ্রাহ্য করিয়াই কালনেমীর লঙ্কাভাগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্গাপ্রসাদের তরুণী সহধর্ম্মিণী দশভুজা তাহার স্বর্গীয় শ্বশুরের আদর্শেই যেন সুবিধাবাদী সরিকদের সুবিধার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল, দৃঢ়কণ্ঠে হুম্‌কী দিল,—খবরদার! এ অন্যায়।

এই সূত্রে ঘোষপাড়ায় চাঞ্চল্যের নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। সকলেই বুঝিল, মৃত্যুর পূর্ব্বে বিচক্ষণ বৃদ্ধ, পুত্রকে অক্ষম জানিয়া আদরিণী বধূটির উপরেই তাহার জেদের বোঝাটি চাপাইয়া গিয়াছে! এই প্রসঙ্গে ভবানীপ্রসাদের নিষ্ঠুর ব্যবস্থা ও অসহায়া বধূটির সঙ্গীন অবস্থা লইয়া নানারূপ আলোচনাই পল্লবিত হইবার অবকাশ পাইল।

কিন্তু যে বহুদর্শী মানুষটী বত্রিশ বৎসরের একমাত্র পুত্রকে অতিক্রম করিয়া বাইশ বৎসরের এই অসহায়া বধূটির উপরেই এত বড় গুরুভার বোঝাটি চাপাইয়া গিয়াছিলেন, সুদীর্ঘ জীবনযাত্রার চলার পথে একটি দিনের জন্যও তিনি হোঁচট্ খান নাই বা মানুষের মন লইয়া মানসাঙ্কের সমাধানে হিসাবের ভুল কখনও তাঁহার কেহই ধরিতে পারেন নাই।

তবে অতি-মানুষ সগৌরবে জীবনের খেলা করিয়া লোকান্তরে চলিয়া যাইবার পর, অতি সাধারণ মানুষও তাহার সারা জীবনের হিসাবের ভুল ধরিতে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে! ইহাই জগতের চিরন্তনী নীতি।

ভবানীপ্রসাদ শুধু বয়সেই বংশের সকলের বড় ছিলেন না, সকল বিষয়েই তাঁহার স্থান ছিল সকলের আগে ; বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, সাহস, অর্থ, আচার-নিষ্ঠা, মিতব্যয়িতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা—এগুলির প্রত্যেকটিতে-ই তিনি ছিলেন সবার উপরে। আভিজাত্যের মোহে বংশের আর সকলেই অবস্থা ছাপাইয়া ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত ও আর্থিক মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া চিররুগ্নের অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু হিসাবী ভবানীপ্রসাদ বাহিরের চাল খাটো করিয়া ভিতরের হাল এমন শক্ত করিতে অভ্যস্ত ছিলেন যে, কেহই টুঁ শব্দটী করিতে পারিত না। লোকের আপদে-বিপদে, প্রজাদের দায়ে-ঘায়ে তিনি বরাবরই হাত উপুড় করিয়াছেন। কিন্তু প্রাপ্যপ্রাপ্য নেওয়া ভিন্ন অন্য বাবদে কাহারও নিকট সেই হাতখানি তিনি চিৎ করিয়া পাতিয়াছেন, একথা তাঁহার শত্রুরাও কোনও দিন বলিতে পারে নাই।

পুত্র দুর্গাপ্রসাদের বয়স যখন বাইশ বৎসর, ভবানীপ্রসাদ তখন তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। দশভুজা তখন দশম বর্ষীয়া বালিকা। কিন্তু ভবানীপ্রসাদ কন্যার অনবদ্য রূপ, অসাধারণ দীর্ঘ কুন্তলগুচ্ছ, লক্ষণযুক্ত সুন্দর মুখ ও দীর্ঘায়ত দুইটি চক্ষুর অপূর্ব্ব দৃষ্টিমাধুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ইহার উপর আরও দুইটি বিষয় তাঁহার আগ্রহ উদগ্র করিয়া তুলিয়াছিল। কন্যার পিতা শক্তিসহায় চৌধুরী সেই অঞ্চলের স্বনামখ্যাত শক্তিসাধক এবং তাঁহার একান্তবাঞ্ছিতা পাত্রীর নামটিও ছিল দশভুজা।

ভবানীপ্রসাদ নিজেও শক্তি-উপাসক, দশপ্রহরণধারিণী মহাদেবী দশভূজা তাঁহার ইষ্টদেবী। তিনি কন্যা দেখিয়াই সভাস্থলে উল্লাসের সুরে বলিয়াছিলেন,—এ মেয়ে আমি নেবই, আর কোন কথাবার্ত্তা নেই। আর কোনও কথাবার্ত্তা তিনি তুলেনও নাই, বিনাপণেই ঘটা করিয়া দশভুজাকে গৃহে আনিয়া বধূর মর্য্যাদা দিয়াছিলেন।

বধূর উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারটি উছলিয়া উঠিয়াছিল। গৃহের গৃহিণী পূর্ব্বেই গৃহশূন্য করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, বালিকা বধূকেই সংসারের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবং অল্প বয়সেই সংসারটি পাকা গৃহিণীর মত নিখুঁতভাবে চালাইয়া বধূ সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে দুর্গাপ্রসাদ মহাল হইতে বিষম জ্বর লইয়া বাড়ীতে উপস্থিত হয়, তাহা ক্রমশঃ টাইফয়েড জ্বরে পরিণত হইয়া তাহার জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলে। দ্বিতীয় সপ্তাহে ব্যাধি একেবারে সংহারমূর্ত্তি ধরিয়া বিভীষিকা দেখাইল। দুর্গাসাধক ভবানীপ্রসাদের সকল সাধনাই ব্যর্থ হইয়া গেল, চিকিৎসারও কোনও ত্রুটী তিনি করেন নাই, কিন্তু তাহাও যে নিষ্ফল হইয়াছে, ব্যাধির বৃদ্ধিতে প্রকাশ পাইল। ত্রয়োদশ দিবসে ভবানীপ্রসাদ অচৈতন্য রোগীর ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার শিয়রে উপবিষ্টা শুশ্রূষাপরায়ণা বধূকে লক্ষ্য করিয়া অস্বাভাবিক ভাবেই কহিয়াছিলেন—বৌমা, আমার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আমি যে, চিরআয়তির লক্ষণ তোমার মুখে দেখেই, আর কোনও দিকে না চেয়েই তোমায় দুর্গার পাশে বসিয়েছিলুম। এখনও আমি সে বিশ্বাস হারাতে পারছি না তোমার দিকে চেয়ে, এখনও সেই লক্ষণ তোমার মুখে জ্বল জ্বল্ করছে; এখন শুধু ভরসা তুমি, তোমার সাধনা। আজ চতুর্দ্দশী, আজকের রাতটাই সাংঘাতিক;

আমি দুর্গার কাছে বসছি, তুমি যাও মা, মায়ের মন্দিরে গিয়ে মাথা খোঁড়ো—শেষ চেষ্টা কর মা, যদি ফেরাতে পারো।

বধূ শ্বশুরের আর্ত্তস্বর স্থির হইয়াই শুনিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার কথায় স্বামীর শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠে নাই; শুধু মিনতির কণ্ঠে গাঢ়স্বরে কহিয়াছিল,—আমাকে এইখানেই থাকতে দিন বাবা, এইখানেই আমার সাধনা।

ইহার পর তিনটি দিন, তিনটি রাত্রি প্রলয়-দুর্য্যোগের বিভীষিকা লইয়া অতীত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বধূ এই তিনটি অহোরাত্র একই ভাবে স্বামীর শিয়রে—তাহার সংজ্ঞাহীন মলিন মুখখানির দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, তাহার অদৃশ্য মনোমন্দিরে কোন্ দেবতার তুমুল সাধনা কি প্রণালীতে চলিয়াছিল, সে তত্ত্ব বধূ ভিন্ন অন্য কেহ জানিবার অবকাশ পায় নাই। কিন্তু চতুর্থ দিনের উষায় দুর্গাপ্রসাদের বিকার একেবারে কাটিয়া গিয়াছিল, সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছিল। রোগীর অবস্থা দেখিয়া সকলেই অবাক! চিকিৎসকেরা বলিলেন—চরম অবস্থার এমন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন তাঁহারা এপর্য্যন্ত দেখেন নাই। ভবানীপ্রসাদ উল্লাসের সুরে বলিয়াছিলেন;—ডাক্তার! তোমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে এ রহস্যের সন্ধান পাবে না; এর সন্ধান পেয়েছেন আমার ঐ মা; ক্ষুধা তৃষ্ণা নিত্যকর্ম্ম সব বিসর্জ্জন দিয়ে যিনি মহামায়ীর বোধন বসিয়েছেন নিজের সাধনায়। মা আমার সাবিত্রী হয়ে সত্যবানকে ফিরিয়ে এনেছেন।

এই ঘটনার পর বধূর প্রতি শ্বশুরের আস্থা আরও গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। পুত্র যদিও রোগমুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু পরিপূর্ণরূপে স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে নাই; স্বাভাবিক বুদ্ধি বৃত্তি তাহার ঈষৎ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল, কোনরূপ শ্রম সহিতে পারিত না, কোনও বৈষয়িক

ব্যাপারে মস্তিষ্ক চালনার সামর্থ্যও তাহার ছিল না। সুতরাং গুরুতর বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে ভবানীপ্রসাদকে বধূর সহায়তা গ্রহণ করিতে হইত।—এ অবস্থায় অকস্মাৎ যখন পরলোক হইতে মহাযাত্রার আহ্বান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন যে সংস্কার ও অনুষ্ঠানগুলি তিনি যক্ষের গচ্ছিত ধনের মত সযত্নে রক্ষা করিতেছিলেন, এই শক্তিময়ী বধূটির উপর সেগুলির রক্ষার ভার সমর্পণ ভিন্ন তাঁহার পক্ষে আর উপায়ান্তর ছিল না।

বধূও শ্বশুরের দেওয়া ভারটুকু মাথা পাতিয়া লইয়াছিল, দৃঢ়স্বরে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল,—আপনার মুখরক্ষা করতে আমরা কিছুমাত্র অবহেলা করব না বাবা, মা আমাদের শক্তি দেবেনই।

বধূর মাথার উপর শিথিল হাতখানি রাখিয়া ভগ্নস্বরে ভবানীপ্রসাদ শেষের কয়টী কথা বলিয়াছিলেন,—আমি আশীর্ব্বাদ করছি মা, তুমিই পারবে। আমি চলেছি অনন্তের পথে, আমার জায়গায় দাঁড়িয়েছ তুমি মা দশভুজা, তোমার মনোরাজ্য জুড়ে অধিষ্ঠিতা হোন—জগজ্জননী দশভুজা।

শ্বশুরের আশীর্ব্বাদটুকু সম্বল করিয়া—বধূ উৎসাহে বুক বাঁধিয়াছিল। রুগ্ন স্বামীর হাত ধরিয়া যথাযোগ্য সমারোহে শ্বশুরের শ্রদ্ধানুষ্ঠান সে যখন সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করিয়াছিল, তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় জ্ঞাতিগণ সে সময় মুক্তকণ্ঠ হইয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই ইঁহারা যখন বহুদিনের অর্থগত আকাঙ্ক্ষাটুকু সিদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইয়াই অপ্রত্যাশিত ভাবে বধূর তরফ হইতে প্রবল বাধা পাইলেন, তখন এই প্রশংসিতা বধূটির কুৎসায় সমগ্র ঘোষপাড়া মুখরিত হইয়া উঠিল এবং ঘোষবংশের প্রায় সার্দ্ধশত সরিক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাইশ বৎসর বয়স্কা এই তরুণী বধূটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

৩

বধূ কিন্তু দমিল না, ভয় পাইল না, সঙ্ঘবদ্ধ সরিকদের নানারূপ হুমকী তাহাকে টলাইতে পারিল না। শ্রাব্য অশ্রাব্য বিবিধ কটূক্তির অবিরাম বর্ষণে বিব্রত হইয়া বধূ তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিল না। তাহার দৃঢ় সঙ্কল্প, স্বর্গীয় শ্বশুরের স্থির সঙ্কল্প সে রক্ষা করিবেই।

রুগ্ন স্বামী দুর্গাপ্রসাদ কহিল,—আমার ত শরীরের এই অবস্থা, দু পা চললেই হাঁফিয়ে উঠি, মাথায় কিছু নিতে পারি না, ভাবতে বসলেই মাথা ধরে; তুমি একলা, পরামর্শ দিতে কেউ নেই; ওরা সব গ্রামশুদ্ধ একজোট হয়েছে,—ঝগড়া করে পারবে?

বধূ কহিল,—ঝগড়া ত আমরা করি নি; তুমি একথা কেন বললে?

দুর্গাপ্রসাদ কহিল,—ওরা যা চাইছে, তাতে বাধা দেওয়া মানেই ঝগড়া করা।

বধূ কহিল,—ও কথাটা মিছে বলনি,—পৃথিবীতে যে সব ঝগড়া হয়, সবার গোড়াটাই এক,—একজন চায় আর একজন দেয় না; বলে—অন্যায়। তাতে ঝগড়া বাধে।

দুর্গাপ্রসাদ কহিল,—আমার মনে হয়, মিটমাট সব চেয়ে ভাল।

বধূ জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—এখানে মিটমাটের মানে বুঝতে পারছ ত? দেবোত্তর সম্পত্তি ওরা মুনফার ওপর বিশগুণ পণ নিয়ে বেচতে চায়, আমরা এতে সায় দিলেই মিটমাট হয়ে যায়, তুমি রাজী হতে পার?

দুর্গাপ্রসাদ রুক্ষস্বরে কহিল,—সব সরিক যখন এককাট্টা হয়েছে, আমরা রাজী না হলেও ওদের আটকাতে পারবে ?

বধূ কহিল,—বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, তখনও ত ওরা দল পাকিয়েছিল, বাবা আটকাতে পারেন নি ?

দুর্গাপ্রসাদ কহিল,—বাবার কথা আলাদা, তাঁর কি রকম তেজ ছিল !

বধূ কহিল,—সেই তেজটুকু তিনি আমাকেই দিয়ে গিয়েছেন, কাজেই তাঁর কীর্ত্তি আমাদের রাখতেই হবে।

বিরক্তির স্বরে দুর্গাপ্রসাদ কহিল,—আমাদের মানে—তুমি ! কেন না, আমি ত চিররুগ্ন অকর্ম্মণ্য ; কোন ক্ষমতাই নেই। কিন্তু তুমি বাড়ীর বউ, পারবে ওদের সঙ্গে ?

বধূ কহিল,—আজ ওরা বংশের একটা গচ্ছিত সম্পত্তি কেড়ে নিতে হাত বাড়িয়েছে ; এটা পেলে ওদের আস্কারা আরো বেড়ে যাবে, এর পর আমাদের সম্পত্তিটুকুও যদি নিতে চায়,—ধর, যদি সেই সঙ্গে আমাকেও কেড়ে নিতে চায় ?—তখনো কি এই পারাপারির কথা উঠবে ?

দুর্গাপ্রসাদ কথাটা শুনিয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা শুষ্ককণ্ঠে কহিল,—তোমার এ কথার উপর কোন কথা চলে না ; কিন্তু আমার অবস্থা ত দেখচ ! এ অবস্থায় কি তুমি করতে চাও ?

বধূ স্নিগ্ধস্বরে কহিল,—এ অবস্থাতেও তুমিই আমার মহেশ্বর ! বাবা আমাকে আশীর্ব্বাদ করে গেছেন, আমি তাঁর কীর্ত্তি বজায় রাখতে পারব। তুমিও প্রসন্ন হয়ে ঐ আশীর্ব্বাদ যদি কর, কেউ আমাকে হারাতে পারবে না।

দুর্গাপ্রসাদ কম্পিত হাতখানি তেজস্বিনী সহধর্ম্মিণীর মাথায় রাখিয়া গাঢ় স্বরে কহিল,—এই রুগ্ন মানুষটির মুখের দুটি কথার ওপর যদি তোমার এতই বিশ্বাস, তবে তাই হোক, আমি প্রসন্ন মনেই বলছি—তুমি আমাদের বংশের মুখ রক্ষা কর।

বধূ তৎক্ষণাৎ আঁচলটি গলায় দিয়া স্বামীকে শ্রদ্ধার সহিত গড় করিয়া কহিল,—মনের মশালটি আমার সত্যি সত্যিই এবার জ্বালবার সুবিধা পেলুম।

স্বামী বিস্ময়ের সুরে কহিল,—বল কি?

বধূ হাসি মুখে উত্তর দিল,—নয় ত কি? প্রদীপ যতই মিট্‌ মিট্‌ করুক আর মশালে যতই মশলা থাকুক, জ্বালাতে হলে তার শিখাটুকুর পরশ চাই-ই।

স্বামী একটি নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যথার সুরে কহিল,—তবু যদি প্রদীপটি নিবে না আসত!

সপ্রতিভ-কণ্ঠে বধূ তৎপর হইয়া কহিল,—ইস্‌, নিবলেই হল! আর আমি যে [illegible] তার পাট করছি, পলতে উস্‌কে দিচ্ছি, সে বুঝি বৃথা?

স্বামী মৃদুকণ্ঠে কহিল,—সে যতই কর, প্রদীপের প্রাণ আর কতটুকু বল! লোক কথায় বলে,—তার তলাতেই অন্ধকার।

বধূ কহিল—কিন্তু আমি যে-প্রদীপের শিখা থেকে আমার মশাল ধরিয়ে নিয়েছি, সে আলোয় তার তলায় অন্ধকারও ঘুচে যাবে, মশাই!

স্বামী হাসিয়া কহিল,—সত্যি, পৌরুষের গর্ব্বে গৃহিণীর সাহচর্য্যের কথাটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। শাস্ত্রকারেরা মিছে বলেন নি—গৃহিণীই গৃহ আর গৃহিণীর সাহচর্য্যেই পুরুষ ভোগ করে পুরুষার্থ! ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী-গৃহমুচ্যতে!

বয়সের দিক দিয়া এখন যিনি ভবানীপ্রসাদের পরবর্ত্তী, তাঁহার নাম কালাচাঁদ। বয়স প্রায় আটান্ন, বৃহৎ সংসার, বহু পরিজন, সেই সূত্রে অভাবের আয়তনও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। ইঁহাকেই পুরোভাগে খাড়া করিয়া পরবর্ত্তী বিভিন্ন বয়সের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসবের পাঠ তুলিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

দশভুজা ইহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শুধু আপত্তি জানাইয়াই নিরস্ত ছিলেন না, তিনি সংবাদ-পত্র-সমূহে বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিয়া জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, ঘোষবংশের বংশধরদের দেবোত্তর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার কোনও অধিকার নাই, তাঁহারা সেবাইত মাত্র। এই সম্পত্তি ক্রয় করা ক্রেতার পক্ষে নিরাপদ ত নয়ই, পক্ষান্তরে ক্রয় করিতে উদ্যোগী হইলে বা প্রয়াস পাইলে অনাচারের পোষকতা ও পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তিলোপ সূত্রে অপদার্থ উত্তরাধিকারিদের দুরাকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।

সংবাদপত্রে এভাবে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ায় এ অঞ্চলে রীতিমত চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়াছিল ও এই সূত্রে সম্পত্তি হস্তান্তরপ্রয়াসীদের প্রাথমিক উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আশাভঙ্গজনিত বিক্ষোভ ও বধূর প্রতি বিজাতীয় রোষ উদ্যোক্তাদের চিত্তে তুষের বহ্নির মতই ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল।

ইহার পরেই দ্বিতীয় তীর নিক্ষিপ্ত হইল।

ভবানীপ্রসাদই বরাবর দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধারকরূপে দুর্গোৎসব

সমাধা করিতেন এবং বিজয়াদশমীর পর সমস্ত সরিকদের ডাকিয়া তাহার হিসাব দিতেন। প্রতি বৎসরই সমবেত জ্ঞাতিগণ তন্ন তন্ন করিয়া হিসাব পরীক্ষা করিয়াও কোনও ভুল ধরিতে ত পারিতেনই না, উপরোক্ত সবিস্ময়ে দেখিতেন, ব্যয়ের পরিমাণ আয়ের অঙ্ককে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং ফাজিলের শতাধিক টাকা ভবানীপ্রসাদ হাওলাত বলিয়া দিয়াছেন।

বর্ষা পড়িলেই, প্রতি আষাঢ়ে ভবানীপ্রসাদ সরিকদের ডাকিয়া আগামী দুর্গোৎসবের কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করিতেন। কালাচাঁদ এই সময় প্রতি বৎসরই পূজার কর্ত্তৃত্ব স্বহস্তে লইবার জন্য দল পাকাইতেন, ভবানীপ্রসাদের সম্মুখে কথাটা স্পষ্ট না পাড়িলেও উসখুস করিতেন। কিন্তু তলে তলে তাহার এই প্রচেষ্টা ভবানীপ্রসাদের দৃষ্টি এড়াইত না, তিনি হাসিয়া বলিতেন,—এ ভার যদি আর কেউ নেয়, আমি ত বেঁচে যাই; কিন্তু ভার কাউকে নিতে হলে দুটো কাজ তাকে আগে করতে হবে; প্রথমেই সে আমাদের সবার সামনে মুখ উঁচু করে জানাবে যে তার দেনাপত্তর কিছু নেই, সে সালভেণ্ট; তারপর এতগুলো বছর ধরে যে টাকাগুলো আমার নামে হাওলাত জমা হয়ে জের টেনে আসছে, সেগুলো বেবাক শোধ দিতে হবে।

এই প্রস্তাব শুনিয়াই কালাচাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গদের উৎসাহ ভাঙিয়া যাইত। সরিকদের মধ্যে এক ভবানীপ্রসাদ ভিন্ন অন্য কেহই মুখ তুলিয়া বলিতে পারিতেন না যে, তিনি খেরো নন; তদ্ভিন্ন ভবানীপ্রসাদের দেনা উসুল করিবার সামর্থ্য কাহারও ছিল না। সুতরাং ভবানীপ্রসাদ অবাধেই বরাবর দুর্গোৎসবের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং প্রতি বৎসরেই প্রাথমিক সভায় পরিহাসের ভঙ্গীতে এই ভার লইবার জন্য সরিকদের আহ্বান করিতেও ভুলিতেন না।

এবার ভবানীপ্রসাদ নাই, কিন্তু তিনি না থাকিলেও তাঁহার উত্তরাধিকারীর যেরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় সরিকগণ পাইয়াছেন, তাহাতে সে পক্ষ হইতে সভা ডাকিবার পূর্ব্বেই কালাচাঁদ নিজে উদ্যোগী হইয়া তাঁহার বাড়ীতেই সভ্যগণকে আহ্বান করিলেন।

বাড়ীর উঠানে সতরঞ্চি বিছাইয়া সভার আসর বসিয়াছে। ঘোষ-বংশের প্রায় সকলেই সভা উজ্জ্বল করিতে অদ্য উপস্থিত। উঠানের পশ্চাতে দালানে চিক ফেলিয়া মেয়েদের স্থান করা হইয়াছে। সরিকদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও আছেন, তাঁহাদের উপস্থিতিও প্রয়োজন। বাড়ী ও পল্লীর মেয়েরাও কৌতূহলী হইয়া চিক-ঘেরা দালানে সমবেত হইয়াছে।

সভাপতির আসনে বসিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ কালাচাঁদ ঘোষ সমবেত সকলের দিকে চাহিয়া সহসা প্রশ্ন করিলেন,—দুর্গা কোথায়? তাকে ত দেখছি না?

ঠিক এই সময় কালাচাঁদের কিশোরী কন্যা মায়া পিতার পার্শ্বে আসিয়া মৃদুস্বরে জানাইল,—দুর্গাদার অসুখ করেছে, তিনি আসতে পারেন নি, বৌদি এসেছেন।

সংবাদটি সকলেই শুনিল ও শ্রোতৃবর্গের মুখগুলির উপরে উত্তেজনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। রুগ্ন দুর্গাপ্রসাদের উপর ইহাদের বিশেষ দ্বেষ ছিল না, যত কিছু রোষ এই বধূটির উপর। এক্ষেত্রে উত্তেজনার ভাব স্বাভাবিক।

কালাচাঁদ ব্যগ্র কণ্ঠে কন্যাকে প্রশ্ন করিলেন,—বৌমা এসেছেন? ভাল, ভাল, কোথায় তাঁকে বসান হয়েছে?

চিকের দিকে অঙ্গুলি তুলিয়াই কন্যা চলিয়া গেল। সভাস্থ সকলের চক্ষুগুলিও মুহূর্ত্তের জন্য চিকের দিকে আকৃষ্ট হইল।

অতঃপর সভার কাজ আরম্ভ হইল। সভাপতি মহাশয় প্রথমেই আর্ত্তস্বরে ঘোষবংশের চূড়া ভবানীপ্রসাদের গুণকীর্ত্তন করিলেন, তাঁহার বিয়োগে এ অঞ্চলের যাহা ক্ষতি হইয়াছে তাহা যে পূরণ হইবে না, অশ্রুবর্ষণ করিয়া তাহা সকলকে জানাইয়া দিলেন। তাহার পর তুলিলেন দেশের দুর্দ্দশার কথা; নানা দিকে বন্যা, অন্ন-কষ্টের সূচনা, আর্থিক অনাটনে দেশবাসীর দুর্গতি। অবশেষে উত্থাপিত কথাগুলির এইরূপ উপসংহার করিলেন যে, দেশের এই শোচনীয় অবস্থায় বাহ্যাড়ম্বর দেখাইয়া বাহবা লওয়া কিছুতেই উচিত নয়, সকল বিষয়েই ব্যয় সঙ্কোচ একান্ত বিধেয়; সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা, এই দুর্ব্বৎসরে এ বংশের ব্যয় সঙ্কুল দুর্গোৎসব বন্ধ থাকে।

প্রাঙ্গণের সভাস্থলে যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন ও সভাপতির বক্তৃতার তালে তালে ঘন ঘন করতালি দিয়া বিষয়টির গুরুত্ব ঘোষণা করিতেছিলেন, বক্তৃতার পর তাঁহারা সকলেই একবাক্যে সভাপতির প্রস্তাবে সায় দিলেন।

সভাপতি মহাশয় এই সময় উৎসাহ সহকারে চিকের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—ঘোষবংশের সরিকদের নিয়েই এই সভা, সকলেরই মত দেওয়া আবশ্যক, এখানে লজ্জা করবার কিছু নেই; মা লক্ষীরাও তাঁদের যা মত প্রকাশ করুন।

দালানের ভিতরে আট দশটি মহিলা সরিক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পাঁচজন সভাপতির প্রস্তাবে সায় দিলেন। অবশিষ্টেরা সঙ্কোচের সহিত জানাইলেন যে, পূজা একেবারে বন্ধ না করিয়া কোনও রকমে নমো নমো করিয়া সারা হয়, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা।

কিন্তু সভাপতি মহাশয় পুনরায় খবরের কাগজের বয়ান তুলিয়া

দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের কথা রীতিমত ঘটা করিয়া বর্ণনা করিলেন,—এক মুষ্টি অন্নের জন্য শত শত ক্ষুধাতুর নরনারী উন্মত্ত—মায়ের দুলালরা এক ঝিনুক দুধের অভাবে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে, আর আমাদের কি এখন কর্ত্তব্য পূজার উৎসবে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করা!

এ কথার পর, আর কাহারও মুখে প্রতিবাদের কথা শুনা গেল না। যে কয়টি মহিলা নমো, নমো করিয়া পূজা সারিবার কথা তুলিয়াছিলেন, তাঁহারাও আর কথা কহিলেন না। মৌনং সম্মতি লক্ষণং ভাবিয়া সভাপতি মহাশয় এইবার উচ্ছ্বাসের সুরে কহিলেন,—তাহলে ঘোষ বংশের সব সরিকেরই মত—এ বৎসর পূজা না হয়।

চিকের ভিতর হইতে পরক্ষণে দৃঢ় স্বরে প্রতিবাদ উঠিল,—এ মত সবার নয় কাকাবাবু, আমি প্রতিবাদ করছি।

সভা স্থলে যেন সহসা বজ্রপাত হইল। একাধিক কণ্ঠের ব্যগ্র প্রশ্ন শোনা গেল,—কে? কে?

চিকের ভিতর হইতে সভাপতি মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী কর্কশ কণ্ঠে শুনাইয়া দিলেন,—আর কে! দুর্গার বউ; ঘোষগুষ্টির বড় তরফ।

কালাচাঁদ চিকের দিকে চাহিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—তুমি প্রতিবাদ করছ বৌমা? আমি যে-সব যুক্তি শোনালুম, তুমি তার খণ্ডন করতে চাও?

বধূ স্নিগ্ধ স্বরে উত্তর দিল,—আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি বুঝিয়ে দেব কাকাবাবু, পূজো বন্ধ করবার যে সব যুক্তি আপনি দিলেন, তো ঠিক নয়।

কালাচাঁদ মুখখানি কালো করিয়া তর্জ্জনের সুরেই কহিলেন,—ঠিক নয়! আমার কথা ঠিক নয়! বটে! আচ্ছা, তুমি কি বলতে চাও বল—

বধূ বিনয়নম্রস্বরে কহিল,—আপনিই একটু আগে আমাদের লক্ষ্য করে বলেছেন কাকাবাবু, এখানে লজ্জা করবার কিছু নেই, স্বচ্ছন্দে সকলে মত প্রকাশ করতে পারে।

মুখখানি রোষে বিরক্তিতে বিকৃত করিয়া কালাচাঁদ কহিলেন,—ভাল, ভাল, তোমার যুক্তিই শুনিয়ে দাও।

সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চিকের দিকে, সবাই উৎকর্ণ এই বেপরোয়া বধূটির মুখের প্রতিবাদ শুনিতে।

বধূ অতি সংক্ষেপে সুস্পষ্ট দৃঢ়স্বরে তাহার প্রতিবাদ জানাইল। প্রথমেই সে কহিল,—দুর্গোৎসবের মোটামুটি ব্যয়টা কিছুতেই অপব্যয় নয়। ঋষিরা অনেক ভেবে চিন্তেই এর ব্যবস্থা করেছিলেন। আনন্দময়ীর উৎসবে যোগ দিয়ে সমাজের সবাই আমোদ পায়, উপার্জ্জনও করে। পুরুত, নাপিত, মালি, মুচি, ঢাকি, পোটো, কামার, ছুতর—সবাই সম্বৎসর মহামায়ীর মুখ চেয়ে থাকে। তারপর উৎসবের তিন দিন সবাই পেটপুরে খেতে পায়। কাকাবাবু যে অকালের কথা বললেন, এই পূজোতে তারও সমাধান ত হয়ে আসছে বরাবর। বিশখানা গ্রামের লোক ঘোষবংশের ঠাকুর দেখতে ছুটে আসে, তিনটি দিন তারা এখানেই থাকে, খায় দায়, আমোদ করে। বাজে খরচ ত আমাদের পূজোয় নেই কাকাবাবু! আমার শ্বশুরের মুখে শুনিছি, বিশখানা গ্রামের লোক পূজোর এক মাস আগে থাকতে দিন গুণতে থাকে, কবে মা আসবেন, আর তারা পরম তৃপ্তিতে মায়ের প্রসাদ তাঁর পূজোর তিনটে দিন পেটপূরে খাবে। একে আপনি অপব্যয় বলতে চান, কাকাবাবু!

বধূর কথায় সমস্ত সভাই একেবারে স্তব্ধ! প্রত্যেকেই মনে মনে প্রশ্ন তুলিতেছিল—তাই ত! কিন্তু কালাচাঁদ বর্ষীয়ান পুরুষ, বংশের জ্যেষ্ঠ,

তিনি কি সহজে পরাজয় স্বীকার করিতে পারেন! তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গটির মোড় ফিরাইতে কহিলেন,—সে সব দিন চলে গেছে বৌমা, তোমরা মেয়ে মানুষ, বাইরের খবর ত রাখ না, দিনকের দিন দেশের অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জমিজমা নিয়ে যাদের কারবার, তাদের কপালে হাত উঠেছে। এই যে পূজোর কথা বলছ, দেখতে শুনতে ভাল—এ কথা কে না বলবে? কিন্তু খরচ যোগাতে পারলে তবে ত? আদায় উসুল নেই বললেই হয়, পূজো করবে কোথা থেকে বাছা? দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে একটি পয়সাও আদায় হবে না—সে খবর রাখ?

চিকের ভিতর হইতে বধূ প্রশ্ন করিল,—দেবোত্তর মহাল থেকে একটি পয়সাও এবার আদায় হবে না,—এ খবর কে আপনাকে দিলে, কাকাবাবু?

বিরক্তির স্বরে কাকাবাবু উত্তর দিলেন,—মহালের নায়েব আমাকে বলেছে।

পুনরায় বধূর প্রশ্ন,—হেতু কিছু বলছেন তিনি? কেন আদায় হবে না!

কালাচাঁদ বাবু কহিলেন,—হেতু ত জানা কথা; গেল বছর সময় মত জল না হওয়ায় ফসল হয় নি, এ বছর এরই মধ্যে অকাল-বন্যায় ধানের চারা সব ডুবে গেছে। খাজনা দেবে কোথা থেকে?

বধূ কণ্ঠস্বর এবার দৃঢ় করিয়া কহিল,—কিন্তু আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন কাকাবাবু, সাবেক কর্ত্তারা অনেক হিসেব করেই দেবোত্তর মহালের জমির ব্যবস্থা করেছিলেন। ও মহালে হাজাশুখো নেই; খালের এলাকায় জমি ব'ল, জল বেশী হলে ভাঁটার সময় কপাট তুলে দিলে জল যেমন বেরিয়ে যায়, শুখো হলে জোয়ারের সময় ক্ষেতে জলও তেমনি আনা চলে। নায়েব আপনাকে মিথ্যে খবর দিয়েছে, কাকাবাবু!

বধূর যুক্তিপূর্ণ কথা অপর সকলকে চমৎকৃত করিলেও, যাঁহার সহিত তাহার কথোপকথন হইতেছিল, সেই বর্ষীয়ান মানুষটির ধৈর্য্য এ কথায় সীমা অতিক্রম করিল। অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে তিনি কহিলেন,—তাহলে তুমি আমাকেও মিথ্যাবাদী বলছ, বৌমা?

বধূ অবিচলিত কণ্ঠে কহিল,—না কাকাবাবু! আপনি গুরুজন, আপনাকে এমন কথা আমি বলতে পারিনা। আমি এইটুকুই বলেছি, আপনি যে কথাটা শুনে তার ওপর এতখানি জোর দিয়েছেন, সেই কথাটাই ভুয়ো! এখন এ নিয়ে মিছে তর্ক করেও লাভ নেই। আমার কথা এই, ওমহলের খাজনা আদায় হবে না, এই আশঙ্কাতেই যদি পূজো বন্ধ করবার প্রস্তাব হয়ে থাকে, সে ভার আমাদের; আদায় না হয়, মায়ের পূজো আটকাবে না, কাজ আমরা চালিয়ে দেবই। আপনারা এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

কিন্তু সভার উদ্যোগীরা বধূর এই প্রতিশ্রুতিতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। এবার আপত্তি উঠিল,—ভবানীপ্রসাদের বিয়োগে বৎসর তাঁহার ছেলে ও বধূর কালাশৌচ। সে হিসাবে এদিক দিয়াও পূজা এ বৎসর বন্ধ রাখাই উচিত।

কিন্তু বধূ একাধিক নজীর দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিল যে, বংশের চূড়া ইহার পূর্ব্বেও খসিয়াছে, তাহাতে মায়ের পূজা বন্ধ হয় নাই, এ ক্ষেত্রে পুরোহিত ঘোষ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরূপে নিজনামে সঙ্কল্প করিয়া পূজা সারিয়াছেন। শাস্ত্রের ব্যবস্থাও এইরূপ।

তথাপি কালাচাঁদ ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ নিরস্ত হইলেন না। শেষে আসল কথাটাই তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিলেন,—পূজো এবৎসর কিছুতেই হবে না।

এ কথার পর বধূর উত্তর শুনিবার জন্য সকলের কৌতূহল স্বাভাবিক। কিন্তু বধূর মুখ হইতে কোনও উত্তর আসিল না। সে স্থানে কালাচাঁদ বাবুর গৃহিণীর কণ্ঠস্বর সমবেত সভ্যদের চমকিত করিয়া দিল,—ওগো, বৌমা রাগ করে উঠে যাচ্ছেন!

কালাচাদ বাবু সঙ্গে সঙ্গে চিকের দিকে চাহিয়া উদ্দেশে প্রশ্ন করিলেন, কথাটার জবাব না দিয়েই তুমি উঠে যে যাচ্ছ বৌমা? তাহলে তোমারও এই মত ত?

বধূ কহিল,—আপনারা ত পূজার ব্যবস্থার জন্য সভ্য ডাকেন নি, কাকাবাবু! পূজা বন্ধ করবার জন্যই সবাই এক সঙ্গে পোঁ ধরেছেন; সুতরাং আমাকে না ডাকলেই ভাল করতেন। আপনাদের আসল উদ্দেশ্যটুকু জানতে পেরে, উঠে না যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি বলুন!

কালাচাদ বাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—তবু তোমাদের মতটা কি আমাদের জানিয়ে দাও।

বধূ কহিল,—আমাদের মত ত নূতন করে জানাবার কিছু নেই, কাকাবাবু! আমার শ্বশুর বরাবর যা জানিয়ে গেছেন আমিও সেই কথাই জানিয়ে যাচ্ছি, পূজো বন্ধো হবে না।

উদ্ধত ভঙ্গীতে কালাচাঁদ ঘোষ তর্জ্জন তুলিয়া কহিলেন,—আলবৎ বন্ধ হবে, কার সাধ্যি দেখি এ বছর কাটামোয় ঘা দেয়।

৮

স্পর্দ্ধিতা বধূটির দর্প চূর্ণ করিতে ঘোষবংশের মাতব্বরগণ অতঃপর যে পন্থা অবলম্বন করিলেন, তাহাতে দেবোত্তর সম্পত্তির সমস্যা জটিল হইয়া উঠিল। ঘোষপাড়ার পার্শ্বেই মতলবপুর গ্রাম, গ্রামের প্রায় অর্দ্ধাংশের অধিবাসী মুসলমান। বছর ত্রিশ পূর্ব্বেও এ অঞ্চলের মুসলমানগণের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, চাষ আবাদ ও সেলায়ের কাজ করিয়া কোনও রূপে তাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। কিন্তু ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ইহাদের অধিকাংশের অবস্থা ফিরিয়া যায় এবং সেই সূত্রে সেখ আতাউল্লা নামে এক ওস্তাগর বিশেষ অবস্থাপন্ন হইয়া উঠেন। এ অঞ্চলের মুসলমান-সমাজের মধ্যে ইনিই প্রথম দালান তুলিয়া ও ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠাপন্ন হন।

সহসা একদিন সকলেই সবিস্ময়ে শুনিল, মতলবপুরের আতাউল্লা ওস্তাগর ঘোষ বাবুদের দেবোত্তর সম্পত্তিটুকু মুনফার উপর বিশগুণ পণ দিয়া প্রায় চল্লিশ হাজার টাকায় খরিদ করিতেছেন, প্রাথমিক বায়নাপত্র হইয়া গিয়াছে, দলিলপত্র লেখা হইতেছে, শীঘ্রই রেজিষ্টারী হইবে এবং আশ্বিনের প্রথমেই তাহারা দখল লইয়া হাল খাজনা আদায় করিবে।

কথাটা দুর্গাপ্রসাদের কানে গেল, বধূ দশভুজাও স্তব্ধ হইয়া শুনিল। বিশ্বস্তসূত্রে ইহাও প্রকাশ পাইল, কথাটা অমূলক নয়। সহজেই বুঝা গেল, পাছে কোনও গোল বাধে এই জন্যে দুর্গাপ্রসাদের অজ্ঞাতেই বায়নাপত্র লেখা পড়া হইয়াছে। দেবোত্তর সম্পত্তি ক্রয় করিতে গোলযোগের অন্ত নাই। কিন্তু মতলবপুরের মসজিদে সম্প্রতি যে মৌলভি

আসিয়া এই শান্তিস্নিগ্ধ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে নানারূপ ফতোয়া দিতেছিলেন তিনিই বিচক্ষণ ওস্তাগর সাহেবকে বুঝাইয়া দেন যে, ইহাতে আশঙ্কার কোনও কারণ নাই, খোদাতাল্লার মর্জ্জিতেই ঘোষ বাবুদের এমন দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছে ; হিন্দুর সম্পত্তি একবার মুসলমানের হাতে আসিয়া পড়িলে ও তাহাতে পীরের যেমন-তেমন একটা আস্তানা গাড়িতে পারিলে তাহা কস্মিনকালেও হস্তান্তর হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৌলভি সাহেব নজীর দেখাইয়াছিলেন, বারাণসীর কতিপয় বিখ্যাত হিন্দুদেবোত্তর সম্পত্তি সেখানকার এই প্রকার সরিকানী কলহসূত্রে ক্রয় করিয়া কোন কোন বিষয়ী মুসলমান কিরূপ লাভবান হইয়াছেন। সুতরাং সেখ আতাউল্লা নিরুদ্বেগেই এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ভূসম্পত্তির মালিক হইবার জন্য অর্থ-নিয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর হন।

যে দিন এই দুঃসংবাদ ঘোষপাড়ায় প্রচারিত হইল, সেইদিন ঘোষবংশের পূজার দালানে সমারোহে দুর্গাপ্রতিমার কাঠামো পূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কুলপ্রথানুসারে এই দিন শুভলগ্নে পুরোহিত প্রতিমার কাঠামো পূজা করিয়া কুম্ভকারকে তাহাতে হাত লাগাইবার অধিকার দেন। পূজার উপচার পূজার দালানে প্রেরিত হইয়াছে, দশভূজা বাড়ী হইতে বাহির হইবে, এমন সময় বিঘ্ন তুলিল এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ।

দুর্গাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল,—এখন কি করতে চাও ?

দশভুজা উত্তর দিল,—যে কাজের আয়োজন হয়েছে, আগে ত সেটা হোক, তার পর, মায়ের মনে যা আছে তাই হবে।

বিস্ময়ের সুরে দুর্গাপ্রসাদ কহিল,—আশ্চর্য্য ! তবু তোমার মন এখনও ভেঙে পড়েনি, উৎসাহ দমে নি !

দশভুজা কহিল,—বাবার কথাগুলোই যে আমার মনে জ্বল জ্বল করছে ! তার কাছে এই শোনা কথাগুলো, ঢাকের কাছে টিমটিমের মত বাজে।

কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেবার মত ত বাজে নয় !

সব বাজই কি মানুষের মাথায় পড়ে ? বেশীর ভাগই শুধু আকাশ কাঁপায়, গর্জ্জনই তাদের সার ! মায়ের ইচ্ছা থাকলে, এদের একারও তাই হবে।

পুরোহিত উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন,—কি শুনছি এ সব মা ?

দশভুজা কহিলেন,—যা শুনেছেন, কানে ছিপি এঁটে রাখুন। আজকের যা কার্য, তাই প্রাণ ঢেলে করুন ভট্চায্যি মশাই ! আজ মায়ের কাঠামোয় ঘা দিবার দিন, এমন ঘা আজ প্রাণের ডাকের সঙ্গে দিন, মার প্রাণ যাতে নেচে ওঠে, দু'শো বছরের শুকনো কাঠামোয় যেন তার সাড়া পাওয়া যায়।

পুরোহিতের মনের আতঙ্ক ও সংশয় বধূর কথায় যেন তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল ; মুগ্ধ বিস্ময়ে তিনি দেখিলেন, প্রাতঃসূর্য্যের আভাটুকু পড়িয়া বধূর আরক্ত মুখখানির প্রভা যেন ঝলমল্ করিতেছে, দীর্ঘায়ত দুইটি চক্ষুর দীপ্তি কি অপূর্ব্ব !—মৃণ্ময় প্রতিমায় চক্ষুদান করিবার সময় দেবীর চিত্রিত আঁখির যে মাধুর্য্য সাধক-পূজককে বিমুগ্ধ করিয়া তুলে, সেই অনবদ্য সৌন্দর্য্যই কি তিনি এই তেজস্বিনী কুলবধূর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন ?

৬

কাঠামো-পূজা সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, এখনও শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি বায়ুমণ্ডলে বিলীন হয় নাই, এমন সময় পূজার দালানের নিম্নে বৃহৎ চত্বরে এক সঙ্গে অনেকগুলি লোকের সমাগম হইল।

দলের অগ্রে ছিলেন কালাচাঁদ ঘোষ এবং তাঁহার পার্শ্বেই সেখ আতাউল্লা ওস্তাগর ও মৌলভি আনোয়ার হোসেন; ইঁহাদের পশ্চাতে ঘোষবংশের বিভিন্ন বয়সের ও বিবিধ অংশের অংশীদারগণ; প্রত্যেকেরই মুখে ঔৎসুক্যের চিহ্ন।

শঙ্খ ঘণ্টার রেশ্ মৌলভি সাহেবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করায় তাঁহার মস্তিষ্কে তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। অধিকার পাইবার পূর্ব্বেই অধিকারীর স্পর্দ্ধায় তিনি প্রথমেই কৈফিয়ৎ চাহিলেন,—বাজনা-বাদ্যি হচ্ছিল কেন?

কালাচাঁদ অপরাধীর ভঙ্গীতে কহিলেন,—ও কিছু নয় মৌলভি সাহেব, মেয়েরা ত এ খবর এখনো পান নি, তাই এখানে পূজো করতে এসেছেন, এই আর কি!

ওস্তাগর সাহেব পূজার দালানে সমবেত মহিলা, বালক-বালিকা, পুরোহিত ও শিল্পীদের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—কি পূজো আজ আপনাদের হচ্ছে ঘোষবাবু?

ঘোষবাবু শুষ্ক কণ্ঠে পূজার তথ্যটি সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—তবে আমাদের কোনও সরিক এতে যোগ দেয় নি, শুধু ভবানীপ্রসাদের তরফ একলাই এ কাজে হাত দিয়েছে, যাকে নিয়েই এত ঝঞ্ঝাট।

ভবানীপ্রসাদের বধূটি যে ঝঞ্ঝাট বাধাইয়াছে, সরিকগণকে বাধ্য হইয়াই তাহা ওস্তাগর সাহেবকে বলিতে হইয়াছে। তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে মৌলভি সাহেব ফতোয়া দিয়াছেন,—কুছপরোয়া নেই, তোমরা সবাই যখন এক যোট, সকলে সই দিলে, একজন না-দিলে কিছুই এসে যাবে না।

ওস্তাগর সাহেব হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—আসল কথা এই, আরও কিছু যাবে। বুড়ো বরাবর বুক দিয়ে পড়েছিল, তার পক্ষের জোর একটু থাকবারই কথা, আচ্ছা—দেখা যাবে তখন!

কিন্তু কথাবার্ত্তা পাকা করিতে এখানে আসিয়াই যখন দেখা গেল, ওপক্ষ হাজির, তখন কথাটা পাড়িয়া হাঙ্গামাটা মিটাইবার জন্য ওস্তাগর সাহেব ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

কালাচাঁদই কথাটা পাড়িলেন। দালানের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া তিনি ভবানীপ্রসাদের পুত্রবধূর উদ্দেশে কহিলেন,—বৌমা! মিছে কাঠামো পূজার ব্যবস্থা করেছ বাছা! সম্পত্তি না বেচে আমরা পারলুম না, দরদস্তুর সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, আজই লেখাপড়া হবার কথা। তোমরা সই না দিলেও আমরা বেচবই। কিন্তু যিনি কিনছেন, তিনি তোমার শ্বশুরেরই বয়সী এই আতাউল্লা ওস্তাগর সাহেব, তোমাকে ইনি বঞ্চিত করতে চান না, বরং কিছু ধরে দিতেই চান। তুমি যখন এখানেই আছ; ইনিও এসেছেন, কথাটা এখনই যদি মিটে যায়, দোষ কি!

আগন্তুকদের উঠানে আসিতে দেখিয়াই বধূ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছিল; কালাচাঁদের কথাগুলি সে স্থির হইয়া শুনিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

ওস্তাগর সাহেব এই সময় কণ্ঠটি পরিষ্কার করিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন,—মা, তোমার শ্বশুরের সঙ্গে আমার খুব সদ্ভাব ছিল, তুমি

আমার মেয়ের মত, আমার কাছে লজ্জা করবার কিছু নেই। আমি সব শুনেছি তোমাদের কথা। ওঁরা সম্পত্তি বেচতে চান, তুমি নারাজ। ওঁরা যখন বেচবেনই, তুমি নারাজ হয়ে কি করবে বল? মাঝথেকে মিছে একটা গোল বাধবে বৈত নয়। তা ছাড়া, আমি তোমাকে আরো হাজার টাকা আলাদা দেব, তুমি যদি সদ্ভাবে রাজী হও।

অবগুণ্ঠনবতী বধূ আস্তে আস্তে দালানের প্রান্তভাগে অগ্রসর হইয়া কহিল,—দেখুন, আমার স্বামী এখানে আসেন নি, বিশেষতঃ তাঁর শরীরও ভাল নেই। আর, আপদকালে কুলবধূ লজ্জা ত্যাগ করিলেও তা দোষের হয় না। আপনি আমার স্বর্গীয় শ্বশুরের বন্ধু, আমার বাবার বয়সী, আপনার কথার উত্তর দিতে আমি লজ্জা করব না।

ওস্তাগর সাহেব খুসী হইয়া কহিলেন,—বেশ মা বেশ; দিব্যি তোমার কথা-বার্ত্তা; আমার ভারি আহ্লাদ হ'ল। আমার কথাগুলো সব শুনেছ ত?

বধূ কহিল,—শুনিছি। এখন আপনার কথার উত্তরে আমি যদি বলি, আমার শ্বশুরের সঙ্গে আপনার সদ্ভাব যখন ছিল, তাঁর স্বধর্ম্ম সম্বন্ধেও সত্যকার মনোভাবটুকুও নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে; এঁরা শত চেষ্টা করেও সে ভাব টলাতে পারেন নি; তাই কি আপনি এতদিন পরে টাকার থলি হাতে ক'রে আপনার স্বর্গীয় বন্ধুর সঙ্গে সদ্ভাবের কথাটুকু এই ভাবেই জানাতে এসেছেন?

ওস্তাগর সাহেব অবাক-বিস্ময়ে এই অবগুণ্ঠনবতী মেয়েটির মুখের তেজোদৃপ্ত কথাগুলি শুনিলেন। কোনো মেয়ে তাঁহার মুখের উপর এমন সপ্রতিভভাবে কথা কহিতে পারে, ইহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। মৌলভি সাহেবও স্তব্ধ!

কিছুক্ষণ পরে মনে মনে কি ভাবিয়া ওস্তাগর সাহেব কহিলেন,—তুমি মিছে বলনি মা, তোমার শ্বশুরের সঙ্গে আমার যে রকম সদ্ভাব ছিল, তাতে তাঁর সম্পত্তি কিনতে হাত বাড়ানো, হয় ত আমার পক্ষে উচিত হয় নি। কিন্তু মা, আমি হাত গুটিয়ে বসলে, আমার মতন আরও দুশো জন টাকার থলি নিয়ে ছুটে যখন আসবে, তখন দোষের হবে না?

বধূ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল,—আমি যতদূর জানি, বাইরে থেকে কেউ এ সম্পত্তি কিনতে আসবে না। কোন হিন্দু এ সম্পত্তিতে হাত দেবে না। আপনি উদ্যোগী না হলে, এঁরা কিছু করতে পারতেন না। তা ছাড়া, আগেকার কথা যদি আপনি তলিয়ে দেখতেন, কখনই তাহলে লোভের দৃষ্টিতে এর দিকে তাকাতেন না, বরং নিজেই কোমর বেঁধে দাঁড়াতেন—একে রক্ষা করতে।

বিস্ময়ের সুরে ওস্তাগর সাহেব প্রশ্ন করিলেন,—আমি! কি এমন আগেকার কথা আছে, যাতে আমাকে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হ'ত—তোমাদের বিষয় রক্ষা করতে?

বধূ কহিল,—আমার শ্বশুরের কাছে শুনেছি, আপনাদের গ্রামের মসজিদ এ-বংশের কর্ত্তারাই তৈরী করিয়ে দেন, যে লাখরাজ জমি থেকে মসজিদের খরচ চলে, সেও এঁদেরই দেওয়া।

বধূর এ কথায় মৌলভি সাহেবের মুখে রোষের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল. ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—ঝুট্! ঝুট্!

ওস্তাগর সাহেব কথাটা শুনিয়াই মুখখানা নীচু করিয়াছিলেন, মৌলভি সাহেবের তীক্ষ্ণ স্বরে বিচলিত হইয়া মুখ তুলিয়া কহিলেন,—ঝুট্ নয় মৌলভি সাহেব, ওঁর কথা সত্যি।

বধূ কহিল,—আর সেই কর্ত্তারাই এই মন্দিরের পূজো পাঠ বরাবর

বজায় রাখবার জন্য যে সম্পত্তি দিয়ে যান, সেইটুকুই আজ আপনি লুঠ করতে এসেছেন ?

ওস্তাগর সাহেব গাঢ় স্বরে কহিলেন,—লুঠ করতে এসেছি ! কি বলছ তুমি মা ? রীতিমত টাকা দিয়ে কিনব বলেই—

বধূ কথাটায় বাধা দিয়া কহিল,—দেবোত্তর সম্পত্তি কি দানবিক্রী হয়, যে কিনতে এসেছেন ? একে লুঠ করা ভিন্ন কি বলব !

কিন্তু তুমি কি শোননি মা, তোমাদের অত বড় তীর্থস্থান কাশীতে ত কত দেবোত্তর সম্পত্তি বিক্রী হয়ে গেল ! এই ত গেল বছর রাজনগরের রাজারাই তাঁদের গড়ুরেশ্বরের দেবালয় মদনপুরার মুসলমান বেপারীকে বেচে দিলে ? কি করলে তোমাদের কাশীর লোক ?

বধূ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল,—কাশীর লোকের কথা আমি বলতে পারি না, কিন্তু আমার কথা আমি বলতে পারি। সেখানে যা সম্ভব হয়েছিল, এখানে তা হবে না এটুকু আপনাকে জানাতে পারি। যে রাজাদের কথা আপনি তুললেন, বোধ হয় আমার মত মেয়ে তাঁদের বংশেই ছিল না, থাকলে এমন অনাচার কখনই ঘটতে দিত না।

মৌলভি সাহেব ওস্তাগরের দিকে চাহিয়া উচ্ছ্বাসের সুরে কহিলেন,—এ লেড়কীর ত ভারী রোক্ দেখছি ! এতখানি ত বরদাস্ত করা যায় না।

ওস্তাগর সাহেব রীতিমত কোপের ভঙ্গীতে কহিলেন,—তাহলে তুমি এই নিয়ে একটা গোল বাধাতে চাও বল ? সই তবে দেবে না ?

বিদ্রূপের সুরে বধূ কহিল,—সই দেব আমি ! এই প্রত্যাশা করেই বুঝি হাজার টাকার লোভ দেখাচ্ছিলেন ?

রুদ্ধকণ্ঠে ওস্তাগর সাহেব কহিলেন,—আচ্ছা যদি—

বধূ কহিল,—আরও দর চড়াতে চান ? কিন্তু মৌলভি সাহেব ত

আপনার কাছেই রয়েছেন, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন, পৃথিবীর সমস্ত টাকার বিনিময়ে এত বড় অপকর্ম্ম কতটুকু সম্ভবপর! আপনাদের মসজিদের এলাকার এক কাচ্চা জমি টাকা নিয়ে আপনারা বেচতে পারেন?

মৌলভী সাহেব গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, বেয়াদপি, বেয়াদপি!

ওস্তাগর সাহেব অতিশয় স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন,—বেয়াদপি আমাদেরই মৌলভি সাহেব! খাঁটি কথাই উনি বলেছেন; সত্যি, আমরা ভুল করে দুটো ধর্ম্মের মাঝে আগোড় তুলে খোদাকে পর্য্যন্ত আলাদা করে দিয়েছি। এই সম্পত্তি যদি কোন মসজিদ বা মক্তবের হ'ত, আপনি কি আমাকে কিনতে পরামর্শ দিতেন?

মৌলভি সাহেব মুখখানি ম্লান করিয়া সংশয়ের স্বরে প্রশ্ন করিলেন,— তাহলে কি এ সম্পত্তি ছেড়ে দেবেন ওস্তাগর সাহেব, কিনবেন আপনি?

দৃঢ় স্বরে ওস্তাগর সাহেব কহিলেন,—এখানো একথা আপনি জিজ্ঞাসা করছেন মৌলভি সাহেব! আজ আমার মনের একটা মস্ত ভুল ভেঙে দিয়েছেন আমার ঐ মা! আমি ত এ সম্পত্তি কিনবই না, অপর কাউকে এ মুখো হতে দেব না—যে কেনবার মতলবে আসবে।

কালাচাঁদ ও তাহার ভক্তবৃন্দ এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়াই দুই পক্ষের কথা কাটকাটি শুনিতেছিলেন। ওস্তাগর সাহেবের শেষের কথা শুনিয়া কালাচাঁদ বোমার ন্যায় একেবারে ফাটিয়া পড়িলেন, দুই চক্ষু পাকাইয়া কহিলেন,—বটে! তাহলে বায়নায় হাজার টাকা বরবাদ হয়ে যাবে, এটা যেন মনে থাকে।

ওস্তাগর সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উপেক্ষার স্বরে কহিলেন,—জাহান্নমে

যাক্ ও হাজার টাকা! আজ যে শিক্ষা আমি পেয়েছি আমার ঐ মায়ের কাছে, লাখ টাকাতেও তা মেলে না।

ওস্তাগর সাহেবের এই ভাব-পরিবর্ত্তনে সকলেই চমৎকৃত। পূজার দালানে যাহারা ছিলেন, অপ্রত্যাশিত উল্লাস তাঁহাদের চক্ষুগুলি সিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। পুরহিত ঠাকুরের মনে জাগিতেছিল, যজমান বধূর মুখের কথা, চক্ষুর সেই চক্ষুচমৎকারী দৃপ্তি!

বধূর চিত্তটিও তখন তৃপ্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। মুখের অবগুণ্ঠনটুকু একটু তুলিয়া সে এবার উল্লাসের সুরে কহিল,—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন বাবা! আপনি যে সম্পত্তিটুকু গ্রাস করতে এসেছিলেন, তাঁরই ইচ্ছায় আজ থেকে সেই সম্পত্তির অছি হলেন।

ওস্তাগর সাহেব ভাবগদ্‌গদ্‌স্বরে কহিলেন,—এর গোড়ায় মা তুমি, তোমরা মায়ের জাত। তোমরা যতদিন আছ, তোমাদের ধর্ম্ম, তোমাদের পূজা ঠিক থাকবে। আলমগীর বাদশা যেখানে হার মেনে গেছে, সেখানে কিনা কোমর বেঁধে এসেছে আতাউল্লা ওস্তাগর, আর মৌলভি আনোয়ার হোসেন! আরে ছ্যা!

জাগ্রতা ভগবতী

নির্ম্মলা।

পাঁচ

১

রেসের মরশুম খতম হইলে বিখ্যাত রেস-বাবু নগেন্দ্রনাথ শীল লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ করিতে বসিল। হিসাবে দেখা গেল, সমস্ত খরচ-খরচা-বাদ এ বৎসর তাহার লাভ হইয়াছে প্রায় পৌনে ছয় হাজার টাকা।

নগেন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিল,—গেল বছর লোকসান ছিল তিন হাজার, এবছর তা তুলে, পৌনে তিন হাজার তাহলে ঘরে এল, মন্দ কি!

পারিষদ প্রেমচাঁদ দেঁতো হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল,—রেসের বাবার সাধ্য কি নগেন শীলের টাকা হজম করে! দেখছ ত, সুদে আসলে উগ্‌রে দিলে!

নগেন্দ্রনাথ কহিল,—তাহলে এখন কি করা যায় প্রেমচাঁদ? কলকেতার হাওয়া আর ভাল লাগছে না।

প্রেমচাঁদ কহিল,—সত্যি, এখন কিছুদিন বাইরে গিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করা দরকার;—রেসের ঠেলায় দুটো মাথাই যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে।

প্রেমচাঁদ ধনী যুবা নগেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু, মন্ত্রী ও সকল কর্ম্মেই সহচর। বহুক্ষণ পরামর্শের পর স্থির হইল—দুইবন্ধু মাসখানেক কাশীর হাওয়া খাইয়া শ্রান্ত মাথা দুইটিকে পরিপুষ্ট করিয়া ফিরিবে।

কাশী যাইবার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে, এমন সময় নগেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী নির্ম্মলা জেদ ধরিয়া বসিল, সেও কাশী না গিয়া ছাড়িবে না।

নগেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল এবার দুই বন্ধুতেই দুই-একজন চাকর-বাকর সঙ্গে লইয়া সংক্ষেপেই কাশীর আমোদ উপভোগ করিয়া ফিরিবে। নির্ম্মলার আবদার শুনিয়া তাহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। প্রেমচাঁদও ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল,—এইখানেই মুস্কিলের পালা, পরিবার সঙ্গে থাকলে যে আমোদ ভোগ করতে চলেছ, তা ত পাবেই না, বরং আপদকে কাছায় বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে, এটা কিন্তু বুঝে নিয়ো।

নগেন্দ্রনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—বুঝি সব, কিন্তু উপায় নেই; রেস খেলা নিয়ে এই সারা সিজ্‌নটা চটাচটি হয়ে আছে, এখন আবদার না রাখলে আর নিষ্কৃতি নেই! তা এক কায করা, মিছরীপোখরার বাড়ীতেই ওকে নিয়ে ওঠা যাবে, আর আমাদের স্ফূর্ত্তির জন্য গঙ্গার ধারে একখানা আলাদা বাড়ী নিলেই চলবে।

কথা পাড়িবামাত্রই প্রেমচাঁদ বন্ধুর মতলবটুকু বুঝিয়া লইয়া কহিল,—এ ব্যবস্থা বরং মন্দের ভাল; আর এ রকম বাড়ীও আমার জানা দু' একখানা আছে, তবে আর কি, দুর্গা বলে দিন স্থির করে ফেল।

২

মিছরীপোখরায় নগেন্দ্রনাথের একখানি মাঝারী রকমের বাড়ী আছে। বাড়ীখানির সম্মুখে ছোট একটু বাগান, চারিধারে সুউচ্চ প্রাচীর দেওয়া; বাড়ীটি ছবির মত ঝকঝকে ও পরিষ্কার। একজন মালী বাগান ও বাড়ীর ভার লইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করে।

নির্ম্মলাকে লইয়া নগেন্দ্রনাথ এই বাড়ীতে আসিয়া উঠিল। সঙ্গে আসিল নির্ম্মলার সহচরী-স্থানীয়া তরুণী পরিচারিকা কাদম্বিনী, একটি পাচক ও একজন উড়িয়া ভৃত্য।

আহারাদির পর প্রেমচাঁদ নির্ম্মলাকে শুনাইয়া নগেন্দ্রনাথকে কহিল,—আমি তাহলে বেরুই ভাই, বাড়ী একখানা ঠিক করতে হবে, আমারও এঁরা সব আসছেন কি না!

নির্ম্মলা অন্তরালে থাকিয়া উড়িয়া ভৃত্যকে দিয়া বলাইল,—সে ত ভালই, ওঁর বাড়ীর মেয়েছেলেরা এখানেই উঠুন না, আলাদা বাড়ী ভাড়া করবার কি দরকার!

নগেন্দ্রনাথ অর্থপূর্ণ নেত্রে প্রেমচাঁদের দিকে চাহিল, তাহার দৃষ্টি যেন তাহাকে বলিতেছিল, কেমন, ব্যাপার বুঝছ ত!

প্রেমচাঁদ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে নির্ম্মলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—সে ত ঠিক কথা, চিরদিন আপনারই খেয়ে আসছি, আপনার আশ্রয়ে মাথা গুঁজতে আর বাধা কি! তবে দেশেরও কতকগুলো অপোগণ্ড আসছে কিনা, সে এক পঙ্গপাল, এখানে তাদের আনতে ভরসা হয় না এই যা!

নির্ম্মলা আর কিছু বলিল না সত্য, কিন্তু অন্তরাল হইতেই তাহার দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু দুই বন্ধুর তৎকালের হৃদয়ের অভ্যন্তর যেন সহজেই দেখিয়া লইল।

নগেন্দ্রনাথের উপর নির্ম্মলার এই সন্দেহের কারণও কিছু যে ছিল না তা নয়। প্রতি বৎসরই নগেন্দ্রনাথ কাশীতে দুই তিনবার হাওয়া খাইতে আসিয়া থাকে, কিন্তু প্রতিবারই সে নির্ম্মলাকে পরিহার করিয়া আসিতে পারিলেই যেন বাঁচিয়া যাইত। নির্ম্মলা কোন সূত্রে সংবাদ পাইয়াছিল যে, তাহার স্বামীর মত এক শ্রেণীর ভাব-বিলাসী বাবু কাশীতে হাওয়া খাইবার ছলে গিয়া এমন অনেক কিছুরই মাথা খাইতে লালায়িত হন, যাহা শুনিলে দুই কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করিতে হয়। তাই এবার যে এই খামখেয়ালী স্বামীটির সঙ্গে আসিবার জন্য এতটা জেদ ধরিয়াছিল এবং তাহার প্রত্যেক কার্য্যটির উপর দৃঢ় লক্ষ্য রাখিয়াছিল।

৩

নির্ম্মলা কলিকাতার কোনও প্রসিদ্ধ বনিয়াদী ধনীর কন্যা, নির্ম্মলার রূপের খ্যাতি ত ছিলই, কিন্তু রূপ অপেক্ষা তাহার উপস্থিত বুদ্ধি ও সকল বিষয়েই নির্ভীক স্বচ্ছন্দভাব নগেন্দ্রনাথকে বাধ্য, মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়াছিল। যতবার নগেন্দ্রনাথ নির্ম্মলার সহিত বুদ্ধির যুদ্ধ করিতে গিয়াছে, ততবারই সে পরাস্ত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে। নির্ম্মলার বিদ্যার দৌড় কতদূর তাহা নগেন্দ্রনাথ ঠিক পরিমাণ করিতে পারে নাই বা পরিমাণ করিবার উপযুক্ত মাপকাঠি তাহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। নগেন্দ্রনাথ যদিও প্রবেশিকা পরীক্ষার গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে প্রসঙ্গক্রমে নির্ম্মলার মুখে এমন সব লেকচার শুনিত, যাহার সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিবার মত সামর্থ্য তাহার আছে বলিয়া মনে করিতে পারিত না, কাযেই বিদ্যা-বিষয়ে বুদ্ধিমান নগেন্দ্রনাথ নির্ম্মলাকে কখনও ভুলেও প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিত না। নগেন্দ্রনাথ এহেন বুদ্ধিমতী ভার্য্যার উপর তাহার ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়া স্বয়ং বৈঠকখানা, রেস ও বিবিধ আমোদ-প্রমোদের মধ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।

ফলতঃ আমাদের সংসারে সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকাংশস্থলেই যেমন স্বামীর বিদ্যা ও বুদ্ধির উৎকর্ষ লক্ষিত হয় আর এই সূত্রে স্ত্রী স্বামীর সংসারে সর্ব্ববিষয়ে স্বামীর প্রাধান্য মানিয়া লইয়া থাকে,—নগেন্দ্রনাথের অদৃষ্টক্রমে ঠিক ইহার বিপরীত ঘটিয়াছিল। নগেন্দ্রনাথ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে, বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, চরিত্রগত নিষ্ঠা

সকল বিষয়েই নির্ম্মলা তাহার উপরে, কাজেই পদে পদে নগেন্দ্রনাথকে নির্ম্মলার বাধ্য হইয়া চলিতে হইত।

নগেন্দ্রনাথ নির্ম্মলাকে লুকাইয়া রেস খেলিলেও তাহা নির্ম্মলার অবিদিত থাকিত না, অথচ নগেন্দ্রনাথ নির্ম্মলার নিকট কখনই স্বীকার করিতে চাহিত না যে, সে রেস-কোর্সের ত্রিসীমানার মধ্যেও কখনও পদার্পণ করিয়াছে!

কাযেই একদিন শনিবার বেলা একটার মধ্যেই যখন নগেন্দ্রনাথ সাহেবী-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া টুপী লইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল, তখনই নির্ম্মলার জরুরী আহ্বান আসিল। সে আহ্বান উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা নগেন্দ্রনাথের ছিল না। নির্ম্মলা তাহাকে সহসা বলিয়া বসিল,—একটু দাঁড়াও, আমিও তৈরি হয়ে আসছি; চল দুজনে আজ মিউজিয়ম দেখে আসি।

নগেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইয়া থতমত খাইয়া কহিল,—আমি যে এক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি, আর একদিন না হয়—

বাধা দিয়া নির্ম্মলা বলিল,—বেশ ত,—আমি মোটরে বসে থাকব, তুমি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাবে; তারপর তোমার দেখা সাক্ষাতের কায হয়ে গেলে তখন মিউজিয়ম যাওয়া যাবে।

এইবারে নগেন্দ্রনাথের বুদ্ধি সকল যুক্তিই হারাইয়া ফেলিল; নির্ম্মলার কথাটা কাটাইবার মত কোনও সমীচীন ফন্দী তাহার মাথায় আসিল না, ওদিকে রেসের মাঠে শ্যামের বাঁশী বাজিয়াছে, আর ত উপায় নাই, সুতরাং নিরুপায় নগেন্দ্রনাথ তখন গদ্‌গদ্-স্বরে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া সে দিনের মত নিষ্কৃতি চাহিয়া মুক্তি পাইল।

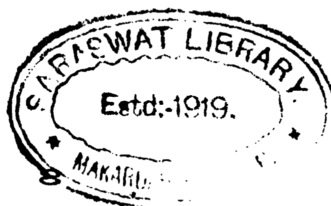
এইরূপ অভিনয় প্রায়ই হইত। বুদ্ধিমতী নির্ম্মলা স্বামীকে এইভাবে

পদে পদে অপদস্থ করিয়াই নিরস্ত হইত, স্বামীর উন্মত্ত বাসনাকে সবলে সংযত করিতে সে আগ্রহ প্রকাশ করিত না। সহচরী কাদম্বিনী তাহার এদিকে দুর্ব্বলতা দেখিয়া যখন খোঁটা দিত, তখন নির্ম্মলা বলিত,—পুরুষ জাতটাকে তুই এখনও ঠিক বুঝতে পারিস নি কাদম্বিনী, খুব বুদ্ধি করে আস্তে আস্তে এদের খেলিয়ে ধরাই ভালো—যেমন খুব মিহি সুতোয় খুব বড় মাছকে গেঁথে তুলতে হয়। এদের মনে যে বাসনাটা উদ্দাম হয়ে ছুটেছে, সে বাসনা যদি আমি এক দিনেই জোর করে থামিয়ে দিই, তাহলে মনটাই ভেঙে যাবে যে। আজ আমার কাছে ধরা পড়ে স্বীকার করেছে রেস খেলে; প্রতিজ্ঞা করেছে, আজ বই আর খেলবে না; এ প্রতিজ্ঞা সে রাখতে পারবে না তা জানি, কিন্তু আসছে বছর সে যে আর রেসের পথে পা বাড়াবে না, এটা তুই স্থির বলে জেনে রাখিস।

কাদম্বিনী নির্ম্মলার শৈশব-সহচরী। এই পিতৃমাতৃহীনা বিধবা তরুণীটি পিতৃগৃহ হইতেই নির্ম্মলার সঙ্গিনীরূপে তাহার স্বামীগৃহে আসিয়াছিল। নির্ম্মলার ন্যায় স্বভাব-শুদ্ধা নারীর সাহচর্য্যে কাদম্বিনীর নিষ্ঠা ও সংযম সহরের সমস্ত প্রলোভনকে জয় করিতে পারিয়াছিল।

ধনাঢ্য নগেন্দ্রনাথের ধনগর্ব্বিত দৃষ্টি শুধু রেসের ঘোড়ার গতির উপর আবদ্ধ থাকিত না, সে দৃষ্টি রূপসীর রূপের গতিও লক্ষ্য করিত। প্রায়ই দেখা যায়, লাম্পট্য-প্রভাবে যাহাদের চিত্ত ব্যাধিগ্রস্ত, তাহাদের পরিণীতা সহধর্ম্মিণীরা অধিকাংশক্ষেত্রেই অনবদ্য রূপৈশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া থাকে; কিন্তু দুর্ব্বার ব্যাধির মোহে তাহাদের দৃষ্টি এই সফল, গৃহদীপ্তির দিকে আকৃষ্ট না হইয়া অনায়ত্ত রূপদীপ্তির দিকে ছুটিয়া থাকে। নির্ম্মলার দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুষ্ট ব্যাধি নগেন্দ্রনাথকেও অভিভূত করিয়াছিল। নির্ম্মলার ন্যায় সহধর্ম্মিণী পাইয়াও নগেন্দ্রনাথ তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে নাই.

ডুবিয়া ডুবিয়া প্রায়ই জলপান করিত, কাশীতে গিয়া পারিষদ প্রেমচাঁদের সহায়তায় যে সব কীর্ত্তি সে করিত, তাহা যেমন কদর্য্য, তেমনই কুরুচিজনক তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুর্ব্বার ব্যাধির মোহে পরিণীতা। কাশী হইতে লিখিত একখানি বেনামা পত্রে নির্ম্মলা স্বামীর কুকীর্ত্তির সংবাদ পাইয়াছিল, কিন্তু সে এই পত্রে সহসা বিশ্বাস করিতে পারে নাই, বা স্বামীকেও এ সম্বন্ধে সে কিছুই জিজ্ঞাসা করে নাই। তাহার স্বামী যে অধঃপতনের এত নিম্নে নামিয়া পড়িয়াছে, তাহা সে কল্পনা করিতেও দ্বিধা করিতেছিল। তাহার মনে হইয়াছিল, তাহার স্বামীর কোনও শত্রু তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্য এরূপ কদর্য্য পত্র লিখিয়াছে। তত্রাচ সে স্বামীকে পরীক্ষা করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করে নাই, স্বামীর প্রত্যেক আচরণ ও প্রতি পদবিক্ষেপটির প্রতি সে নিপুণ লক্ষ্য রাখিয়াছিল। আজ প্রেমচাঁদের 'বাড়ীভাড়ার প্রস্তাব শুনিয়া ও দুই বন্ধুর ভাবভঙ্গী দেখিয়া নির্ম্মলার মনেও সন্দেহের একটা খোঁচা খরতররূপেই বিঁধিয়া গেল।



নির্ম্মলা স্বামীকে চক্ষুর উপর রাখিবার জন্য চেষ্টিতা হইলেও, ধড়িবাজ প্রেমচাঁদ মানমন্দিরের কাছে একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া এমন যুক্তিপূর্ণ উপায়ে নগেন্দ্রনাথকে নিত্যই সন্ধ্যার পর লইয়া যাইতেছিল যে, নির্ম্মলা ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে আটকাইতে পারিতেছিল না।

প্রেমচাঁদের পরামর্শে নগেন্দ্রনাথ একদিন নির্ম্মলাকে কহিল,—আমরা ত' দুজনে নিত্যই গঙ্গার ধারে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছি, তা তোমরাই বা ঘরে চুপ করে বসে থাক কেন? তোফা বেড়িয়ে বেড়াও, ঘাটে গিয়ে বস, গান শোন, এখানে ওসব পর্দ্দা-টর্দ্দার তোয়াক্কা কেউ রাখে না।

নির্ম্মলা কহিল,—তুমি সঙ্গে থাকবে ত?

নগেন্দ্রনাথ কহিল,—সেটা যেন কেমন কেমন দেখায়; কেননা, কাশীতে আমার অনেক চেনাশুনা লোক রয়েছে, পরিবার নিয়ে গঙ্গার ঘাটে বেড়াতে কেমন একটা সঙ্কোচ আসে।

নির্ম্মলা মুচকিয়া হাসিয়া কহিল,—আর আমরা যদি বে-পরোয়া পথে-ঘাটে বেড়াই, তাতে কোন সঙ্কোচ মনে আসবে না ত?

নগেন্দ্রনাথ কহিল,—কিছুমাত্র না, গঙ্গার ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে, দশাশ্বমেধের ঘাট রথের মেলার মত জেঁকে উঠেছে; আজই বেরিয়ে পড়,—গিয়ে দেখে এস কি কাণ্ড! গান নাচ কথকতা কত কি!

প্রত্যহ অপরাহ্ণ হইতে কিছু রাত্রি পর্য্যন্ত কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে উৎসবের সমারোহ দেখা যায়। অবাধে নানা শ্রেণীর কিশোরী তরুণী

প্রৌঢ়া ও প্রবীণাদের সম্মিলনের এমন পীঠস্থান কাশীতে বুঝি আর কোথাও নাই। কি ভাবিয়া নির্ম্মলাও কয়দিন ধরিয়া কাদম্বিনীর সহিত নিত্যই অপরাহ্নে এখানে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। সারা পথে ও ঘাটে শত শত চক্ষু যখন নির্ম্মলার রূপের উপর বদ্ধ হইয়া পড়িত, নির্ম্মলা তখন কাদম্বিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কলহাস্যের সহিত এমন অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে অভিনয় করিত যে, চক্ষুর মালিকরা ত অপ্রতিভ হইতই, সঙ্গে সঙ্গে পথের জনতাও চমকিত হইয়া তাহাদের দিকে তাকাইয়া রহিত।

সেদিন তাহারা উভয়েই দশাশ্বমেধ ঘাটের এক ধারে একখানি কাঠের পাটার উপর একটু স্থান করিয়া লইয়া বসিয়াছিল। ঘাটের সকল স্থানই তখন জনতায় পূর্ণ দুই তিন স্থানে গানের আসর জমিয়াছে, বিভিন্ন বয়সের নরনারীর সমাগম হইয়াছে। নির্ম্মলা ও কাদম্বিনা চারিধারে চাহিয়া চাহিয়া শ্রোতা ও শ্রোত্রীগণের ভাবভঙ্গী দেখিতে লাগিল, আবার এক-একবার গায়ক মহাশয়কে কৃতার্থ করিবার জন্য তাঁহার সেই অপূর্ব্ব ভঙ্গীময় বদনের উপর ছলছল চক্ষু দুটির বেদনাকাতর দৃষ্টিধারা নিক্ষেপ করিয়া জানাইয়া দিল যেন তাঁহার ভাবপূর্ণ গান তাহাদের হৃদয় মনকে একেবারে দ্রবীভূত করিয়া ফেলিয়াছে! নবাগতা তরুণী দুইটির, বিশেষতঃ নির্ম্মলার যুগল চক্ষুর সজল চাহনী—জলদবক্ষ-বিহারিণী খরতর বিদ্যুৎ-শিখার মত সেদিন ঘনঘন গায়ক ঠাকুরের অঙ্গে অঙ্গে এক অপূর্ব্ব শিহরণ জাগাইয়া তুলিতেছিল।

সন্ধ্যা হয় হয়, গানের আসর ক্রমশই পাতলা হইয়া আসিতেছে, নির্ম্মলা ও কাদম্বিনী উঠি-উঠি করিতেছে, এমন সময় শীতলামাতার মন্দিরের চাতাল হইতে এক কৃশকায় লম্বা চেহারার তরুণ যুবা আসরের দিকে নামিয়া আসিল। তাহার বেশ ও বিশেষতঃ কেশের পারিপাট্য এবং

সোপান দিয়া নামিবার বিচিত্র ভঙ্গী নির্ম্মলা ও কাদম্বিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

নির্ম্মলা কাদম্বিনীকে একটু ঠেলা দিয়া বলিয়া উঠিল,—হতভাগা মরেছে রে, দেখছিস আসবার ভঙ্গী! চোখ আর নামাতে পারছে না, প'ড়ে মরে বুঝি!

কাদম্বিনী মুখ মচকাইয়া কহিল,—পড়ে ত তাহলে বুঝি মা শেতলা চোখ চেয়ে দেখেন সব, আমিও তাহলে মার পুজো দিয়ে বাড়ী ফিরি!

কাদম্বিনীর পূজা কিন্তু মা শীতলা আর এযাত্রা গ্রহণ করিলেন না, তরুণ নটবরটি একেবারে তাহাদেরই প্রায় পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল,—তাহার বদ্ধদৃষ্টি তখনও নির্ম্মলার মুখের উপর।

এতগুলি নরনারীর সম্মুখে প্রকাশ্য স্থানে এভাবে এই নবাগত মানুষটিকে নির্লজ্জের মত তাহার দিকে লোলুপদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া রোষে অপমানে নির্ম্মলার নারীহৃদয় বিক্ষুব্ধ হইল, দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, ফড়িঙের মত লম্বা শীর্ণকায় এই মানুষটির গায়ের পরিচ্ছদ ভেদ করিয়া যেন এক কদাকার হিংস্র পশুর লোমময় ত্বক বাহির হইয়া পড়িয়াছে—মুখখানাও পশুর মুখের মত অতি কদর্য্য দেখাইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ঘাটে সমবেত এত লোকের মধ্যে কেহই এই পশুটার আচরণে কটাক্ষ করিল না—কেহই তাহার কর্ণদ্বয় মর্দ্দন করিয়া বুঝাইয়া দিল না যে প্রকাশ্য ঘাটের উপর ভদ্রমহিলার মুখের দিকে এমন নির্লজ্জের মত তাকাইতে নাই! যখন কেহ কিছু বলিল না, তখন নির্ম্মলা কাদম্বিনীর কানে কানে কি বলিয়া, তাহার সেই জ্বলন্তদৃষ্টিকে এমন মধুর ও স্নিগ্ধ করিয়া সেই যুবাটির চোখের উপর

তুলিয়া ধরিল ও সঙ্গে সঙ্গে অপাঙ্গের এক তীক্ষ্ণ হাসির লহর ছুটিয়া গিয়া সেই মধুর দৃষ্টিকে মদিরাময় করিয়া ফেলিল যে, তাহার প্রভাবে সে যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া অজগরের জ্বালাময় দৃষ্টিসম্পাতে স্তব্ধ মেষশিশুর মত একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িল।

পরক্ষণেই নির্ম্মলা বলিয়া উঠিল,—চল্ কাদি, একটু নৌকো করে বেড়িয়ে আসি। দুজনেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল,—যুবাটি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারই একান্ত নিকটে গিয়া নির্ম্মলা দুষ্টুমির হাসিমাখা মুখে তাহার দিকে চাহিয়া, ক্ষণিকের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইয়া আবার অগ্রসর হইল। কয়েকপদ গিয়া আবার ফিরিয়া সেই যুবকটির দিকে চাহিল, সে কি প্রাণোন্মত্তকারী দৃষ্টি!

ঘাটের দিকে নামিতে নামিতে সিঁড়ি ধরিয়া সেই যুবারই প্রায় সম্মুখে আসিয়া নির্ম্মলা তাহাকে যেন শুনাইয়াই আত্মগতভাবে বলিয়া উঠিল,—তাই ত, কাকে বলি বল্না লো—একখানা ডিঙ্গি ভাড়া করে দেয়!

এ কথা-কয়টি যেন যুবাটির কানের ভিতর দিয়া মরমের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। নির্ম্মলার অপূর্ব্ব রূপ তাহাকে এমন অভিভূত করিয়াছিল যে, সে তাহার উদ্দেশ্য ও সহজাত সঙ্কোচ-পরিশূন্য সাহসকেও হারাইয়া বসিয়াছিল। সেই এ পর্য্যন্ত উপরপড়া হইয়া যে কোনও অপরিচিতা সুন্দরীর সহিত আলাপ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, এ বিষয়ে কখনো সে লজ্জা বা সঙ্কোচকে মনের কোণেও আশ্রয় দেয় নাই, কিন্তু আজ তাহার এ কি দুর্ব্বলতা! তাহারই লক্ষ্যভূতা নারীই আজ ইঙ্গিতে সঙ্গীর সন্ধান করিতেছে, শিকার শিকারীকে আহ্বান করিতেছে,—আর সে নীরব, নিশ্চল!

নির্ম্মলাকে আর ডিঙ্গির জন্য আক্ষেপ করিতে হইল না, যুবকটি অতিমাত্রায় ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল,—ডিঙ্গি চাই আপনাদের, এখনি নিয়ে আসছি, আপনারা এখানে দাঁড়ান।—বলিতে বলিতে সে ঘাটের গম্বুজের পাশ দিয়া নৌকার সন্ধানে ছুটিল, তখন তাহার স্ফূর্ত্তি দেখে কে! মনে মনে সে তখন উল্লাসে ভাবিতেছিল, মাছ টোপ ধরেছে, এখন গাঁথতে পারলেই কায ফতে!

৫

কাদম্বিনী কহিল,—তারপর? কি করবে শুনি?

নির্ম্মলা গায়ের রেশমী চাদরখানাকে যথাযথভাবে অঙ্গে সম্বৃত করিতে করিতে কহিল,—বধুর সঙ্গে তরিতে উঠে গঙ্গায় পাড়ি দেওয়া যাবে, আর সেই সঙ্গে তাঁর মতলবখানাও শোনা যাবে, মন্দ কি?

কাদম্বিনী ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—না ভাই, এতখানি ভরসা ভাল নয়, পথে ঘাটে যা কর শোভা পায়, কিন্তু দরিয়ায়—

বাধা দিয়া নির্ম্মলা বলিল,—যদি সত্যি সত্যিই ডুবি? সে ভয় নেই, মাল্লা-মাঝিদের নৌকোয় উঠে অনেকবার কাশীর দরিয়ায় বেড়িয়েছি, তারা 'মা-জী' বলতেই অজ্ঞান, তাদের চোখে কখনও কুদৃষ্টি দেখেছিস কি—যেমন আজ আমরা এইসব ভদ্রবেশী পশুদের চোখে দেখেছি? আর ভয়ের কথা বলছিস্? কোনো ভয় নেই কাদি, পথে-ঘাটে পরদা তুলে বেরুতে হলে ভয়কে মন থেকে আগে ছেঁটে ফেলা চাই; ঐ ত ভড়িঙ্গ বাবাজী, ওকেও কি জঙ্গীপুরুষ ভেবে ভয় করে চলতে হবে? পথে ঘাটে মেয়েদের দিকে চাওয়াটা কত বড় অন্যায় আর তার কি রকম শাস্তি, তা যদি কাশীর এই নরপশুটাকে জানিয়ে দিয়ে না যাই, তাহলে পরদা তুলে পথে বেরিয়ে করলুম কি? শুধু কি বই বগলে করে কলেজে গিয়ে বাবার পয়সার শ্রাদ্ধ করেছি!

কাদম্বিনী কহিল,—যদি মাঝিকে হাত করে নিয়ে আসে?

নির্ম্মলা কহিল,—তার মানে, মাঝ গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে আমাদের লুটপাট করে নেয়? তোর ভয়কেও বলিহারি!

এই সময় পূর্ব্বোক্ত যুবকটি একখানি ছোট ডিঙ্গি হইতে ডাকিল,— নৌকো এনেছি আমি, উঠে আসুন আপনারা।—মাঝি ডিঙ্গিখানা সিঁড়ির নীচেই ভিড়াইয়া দিল, নির্ম্মলা ও কাদম্বিনী ডিঙ্গির উপর উঠিয়া দুইজনে একদিকে পাশাপাশি বসিল, যুবাটি বিপরীত দিকে মাঝির পার্শ্বেই স্থান করিয়া লইয়াছিল।

যুবা বলিল,—কোন দিকে যেতে হবে হুকুম করুন।

নির্ম্মলা সেই হাসি হাসিয়া কহিল,—যে দিকে আপনার ইচ্ছা, আমাদের কি এখন আর দিক-বিদিক জ্ঞান আছে?

ডিঙ্গির মালিক একজন বৃদ্ধ মাল্লা,—যুবা তাহাকে হুকুম করিল,—মণিকর্ণিকার দিকেই চল।

নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল,—ও বাবা, আরম্ভেই মণিকর্ণিকা?

যুবাও হাসিয়া উত্তর দিল,—কেন, মন্দ কি?

নির্ম্মলা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গম্ভীরভাবে কহিল,—মশায়ের পক্ষে মন্দ না হতে পারে—মশাই সম্ভবতঃ বৈরাগ্যের পথে বেরিয়ে পড়েছেন, কিন্তু আমরা এখনো অতটা এগুতে পারিনি, এখনও অনেক আকাঙ্ক্ষা রাখি, বুঝলেন?

নির্ম্মলার এই রহস্যভরা কথাগুলি যুবকটির মাথায় বিষম গোলযোগ বাধাইয়া দিল, সে যে কি উত্তর দিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আপন মনেই জিজ্ঞাসা করিল,—আপনারা কলকেতা থেকে এসেছেন, না?

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল,—আমরা কলকেতার মেয়ে তাতে কোন সংশয় নেই, কিন্তু আপাততঃ বছর দশেক ধরে বাবা বিশ্বনাথের রাজ্যেই বসবাস করছি।

বিস্মিত হইয়া যুবা কহিল,—তাই নাকি, কিন্তু কই আপনাদের ত একদিনও ঘাটে দেখি নি!

নির্ম্মলা কহিল,—দেখবেন কি করে? এতদিন কি পরদার বাইরে পা-টি বাড়াবার এক্তিয়ার ছিল? মালিকের যে শক্ত শাসন, বাবা! এখন শাসনের বাঁধন যেমন আলগা হওয়া, আমাদেরও অমনি পরদা ফাঁক!

উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া যুবা বলিয়া উঠিল,—কি রকম, কি রকম?

নির্ম্মলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—ওমা, রকম এখনও বুঝতে পারলেন না, কি রকম বেটাছেলে আপনি? আরো খোলাখুলি শুনতে চান বুঝি? তা এধারে একটু এগিয়ে আসুন, এসব কথা কি গলা ছেড়ে বলা চলে, বিশেষ ঐ কাঠখোট্টা ছাতুটা---

সলম্ফে যুবা দাঁড়াইয়া উঠিল, কিন্তু গতিশীল ডিঙ্গিতে টাল সামলাইতে না পারিয়া পাটাতনের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল। মাল্লা—হাঁ—হাঁ—শব্দে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নির্ম্মলা ও কাদম্বিনী অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিল। যুবা পরক্ষণেই উঠিয়া ডিঙ্গির হাতার দিকে অল্পপরিসর তক্তা-খানির উপরই বসিয়া পড়িল।

নির্ম্মলা ব্যথিতস্বরে বলিয়া উঠিল,—আহা, লাগে নি ত?

যুবা হাসিয়া উত্তর দিল,—কিছু না! এইবার বলুন ত শুনি; আপনি ও বেটাকে দেখে কিছু কিন্তু করবেন না, বুড়ো মানুষ, বাঙলা কথা বোঝেই না, আর সব কথা শুনতেও পায় না।

নির্ম্মলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—আপনি ত খুব হিসিবী মানুষ দেখছি, বুঝে-সুঝে এমন মাঝির ডিঙ্গি এনেচেন, যে কথাও বোঝেনা, কানেও শুনতে পায় না! হাঁ, এখন আপনার কৌতূহলটি আগে মেটাতে হবে, না? শুনুন, তবে বলি,—আমাদের বাড়ীর মালিক মাস কতকের

জন্য ট্যুরে বেরিয়েছেন—বুঝলেন? তাইতেই না আমরা আপাততঃ শিকলী কেটে বেরিয়েছি।

যুবার মুখখানি হাসিতে ঝলসিয়া উঠিল, উল্লাসভরে সে কহিল,—আচ্ছা! তাই বটে! তা আপনারা কোন মহল্লায় থাকেন বলুন ত?

নির্ম্মলা কহিল,—গণেশ মহল্লায়।

যুবা বলিয়া উঠিল...গণেশমহল্লা? কত নম্বর বাড়ী,—বাড়ীর কর্ত্তার নামটি—

হাসিয়া নির্ম্মলা কহিল,—আমরা মশাই এখন নামকাটা সেপাই, অন্ততঃ এ ক'মাসের মত; ওসব নাম-ঠিকানার কিনারাও এখন মাড়াচ্ছি না, বুঝলেন? আচ্ছা, আমাদের ইতিহাস তো শুনলেন, এইবার আপনার কাহিনীটা শুনি।

ঈষৎ হাসিয়া যুবা কহিল,—আমার কথা আর কি শুনবেন, শুনবার মত কিছুই নয়,—কাশীতে থাকি, ঐ গণেশমহল্লারই পাশে—জঙ্গমবাড়ীতে; আপনার বলতে কেউ নেই, সুখের পায়রার মত আপন মনেই উড়ে বেড়াই।

নির্ম্মলা কহিল,—বটে, তাহলে ত আপনি বাহাদুর ছেলে! তা আপনার নামটি কি শুনি?

যুবা কহিল,—আমার নাম রতনচাঁদ মজুমদার। মজুমদার আমাদের উপাধি, আমরা ব্রাহ্মণ।

গম্ভীর হইয়া নির্ম্মলা বলিল,—ওরে বাবা, জাতসাপ! তাহলে একটা পেরণাম নিন—ওলো কাদি, যে সে মানুষ নয়—বেহ্মদত্যি, পেরণাম কর্।—দুজনেই বিচিত্রভঙ্গীতে যুবার উদ্দেশ্যে নমস্কারের অভিনয় করিল।

রতনচাঁদ হাসিয়া কহিল,—ব্রাহ্মণ বলে নিজের পরিচয় দিতে এখন

সত্যিই লজ্জা করে; আপনি তো আমার দিব্যি খেতাবটি বার করেছেন —বেহ্মদত্যি! সত্যিই, আমি বেহ্মদত্যিই বটে!

নির্ম্মলা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল,—আমার ভরসাটা একবার দেখুন, ছিলেন আপনি তফাতে বসে, কাছে ডেকে আনলুম; দেখবেন—সহসা যেন ঘাড়টি মটকাবেন না দয়া করে!

রতনচাঁদ দাঁতগুলি হাসির উচ্ছ্বাসে বাহির করিয়া কহিল,—আমি তো আর মামদো নই মশাই, যে ঘাড় মটকাবো।

অপ্রতিভের মত অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—মাপ করবেন বেহ্মদত্যি মশাই, এটা ভুলে বলে ফেলেছি; বেহ্মদত্যিরা শুনেছি গায়ে হাত বুলিয়ে মিষ্টি মধুর মন্তর পড়ে বশ করে তবে শিকারকে ধরে, মামদোদের মত শিকার দেখা মাত্রই ঘাড় মটকায় না বটে! আচ্ছা মশাই, কাশীতেও আজকাল মামদোর ভয় হয়েছে না কি?

রতনচাঁদ বলিতে লাগিল,—আগে ত এ ভয় মোটেই ছিলনা; মামদোরা পথে ঘাটে মেয়েদের দেখলে মুখ ফিরিয়ে তফাতে সরে যেত; কিন্তু বছর দুই থেকে এরা সে ভাব বদলেছে,—এখন পথে মেয়েমানুষ দেখলে গা ঘেষিয়ে যায়, ঠাট্টা মস্করা করে; আগে এরা মেয়েদের দিকে ফিরেও তাকাতে ভরসা করত না, এখন দেখবার জন্যে তৈরী হয়ে আসে, আর হারামজাদাদের কি খারাপ চাহনি—

নির্ম্মলা শ্লেষের সহিত কহিল,—বেহ্মদত্যির চাহনীর চেয়েও মারাত্মক নাকি?

এই সময় নৌকা মণিকর্ণিকায় আসিয়া ভিড়িল। রতনচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল,—ঘাটে নামতে চান নাকি?

নির্ম্মলা মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল,—উহুঁ, যে মামদোর ভয় দেখিয়ে

দিলেন ঠাকুর! মরি ত বেহ্মদত্যির হাতেই মরব, মামদো-ফামদোর পাল্লায় পড়ছি নি বাবা!—চলুন, আর একটু ঘুরে ফিরে যাওয়া যাক।

রতনচাঁদ মাঝিকে আরও একটু আগাইয়া শেষে দশাশ্বমেধে ফিরিবার কথা বুঝাইয়া দিয়া স্বস্থানে বসিবামাত্র নির্ম্মলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—এইবার আপনার পেশাটি বলুন ত শুনি; আমাদের কথাবার্ত্তা শুনেই বুঝেছেন নিশ্চয়, আমরা কি রকম মনখোলা মানুষ! আপনিও মন খুলে মনের কথা বলে ফেলুন ত!

রতনচাঁদের ঘটে বিদ্যার অস্তিত্ব না থাকিলেও, সহজাত বুদ্ধির নিতান্ত অভাব ছিল না। নির্ম্মলার কথাবার্ত্তায় সে এটুকু বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, অপরিচিতা সুন্দরীদিগকে আয়ত্ত করিবার জন্য তাহাকে যে সকল কথা বলিতে হয়, এই প্রথম পরিচিতা সুন্দরী যুবতী যেন সে সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াই অসঙ্কোচে তাহার আয়ত্তের মধ্যেই আসিয়া পড়িয়াছে। এরূপ সঙ্কোচশূন্যা সুন্দরীকে এত সহজে করায়ত্ত করা তাহার পক্ষে যে কত বড় একটা লাভের বিষয়, তাহা মনে মনে কল্পনা করিয়া সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল, সুতরাং এস্থলে আর ভূমিকা না করিয়া একেবারে তাহার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সহসা প্রকাশ করাই সে যুক্তিযুক্ত মনে করিল, যখন তাহার শিকার আপনি যাচিয়া চারের মধ্যে আসিয়া তাহাকে খোলাখুলি ভাবেই তাহার পেশা কি তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে।

রতনচাঁদ কহিল,—আপনি যখন খোলাখুলি রকমেই নিজের কথা বললেন, তখন আমিও অবশ্যই আমার কথা বলব বই কি; আমার পেশা কি শুনতে চান? আমি হচ্ছি একজন—শিকারী।—শুনে বিশ্বাস হচ্ছে?

নির্ম্মলার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল,—খুব; বেড়ালের যেমন

গোঁফ দেখলে জানা যায়, সে ইঁদুর ধরতে পারবে কি না, তেমনি পুরুষ মানুষের চোখ দেখলেই চেনা যায় সে সংসারী কি শিকারী ?

রতনচাঁদ অবাক হইয়া নির্ম্মলার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর মুখে হাসি আনিয়া কহিল,—তাহলে আগেই আমাকে চিনে ফেলেছেন বলুন ?

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল,—না চিনে কি অচেনার সঙ্গে দরিয়ায় পাড়ি দিয়েছি মনে করেন ? তারপর ? ঠাকুরের শিকার-পর্ব্বটা কি ভাবে সম্পন্ন হয় সেটা এবার শুনিয়ে দিন।

মাঝি এই সময় মোড় ঘুরাইয়া দশাশ্বমেধের দিকে নৌকা চালাইল। রতনচাঁদ নির্ম্মলার সহিত এতক্ষণ এভাবে সমীহ করিয়া কথা কহিতে হাঁফাইয়া উঠিতেছিল, সময় বুঝিয়া এবার সে তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তির রাস্তা ধরিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ অভ্যস্ত ভাষায় হঠাৎ বলিয়া ফেলিল,—ঢাক-ঢাক্ গুড়-গুড়ে কাজ কি আর! সবই জেনে-শুনে আর ন্যেকা সাজছ কেন বল ত ? দশাশ্বমেধের ঘাটে আমার মত শিকারী বাঘ ভাল্লুক শিকার করতে আসে না, তা ত বুঝতে পারছ ; এখন পথে এস ;—কলকেতার বাবু, বড় লোক,—এই কাছেই আছে, ইচ্ছে করত আজই—এখনই—

কাদম্বিনী নির্ম্মলার পিঠে মৃদু আঘাত করিল,—নির্ম্মলারও সর্ব্বাঙ্গ তখন কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদেরই সান্নিধ্যে সমাসীন ভদ্রবেশী মানুষটির মূর্ত্তিও যেন তাহার এই মারাত্মক কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া যে ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছিল, স্পষ্টই তাহা নির্ম্মলার চক্ষুর উপর প্রতিভাত হইয়া উঠিল ; নির্ম্মলা কষ্টে মুখে হাসি আনিয়া কহিল,—আপনার যে দেখছি আর তর সইছে না, যেন 'ওঠ্

ছুঁড়ি তোর বে!' জানা নেই, শোনা নেই, দেখা সাক্ষেৎ নেই, অমনি গেলেই হল আর কি? পরদার বাইরে পা বাড়িয়েছি বলেই বুঝি অমনি কুলমান এভাবে যার তার হাতেই ভাসিয়ে দিতে হবে?

রতনচাঁদ কহিল,—বেশ ত. আগে না হয় দেখাসাক্ষাতই হোক, পছন্দ হয়—তখন,—আর না হয় তোমরা নৌকোর ওপরেই একটু অপেক্ষা কর, আমি বাবুদের নিয়ে আসি—

ও বাবা, আবার—বাবুরা? ক'জন বাবু আমাদের উমেদার বলুন ত আগে শুনে রাখি।

দুজন বাবু—খুব বড়লোক, নাম অবিশ্যি বলেন নি, তবে খাস কলকেতায় থাকেন, রাজা বললেই হয়,—এই আর একটু আগেই গঙ্গার ধারেই তাঁরা আড্ডা নিয়েছেন, বল ত এখনই—

নির্ম্মলার মুখ সহসা অন্ধকার হইয়া গেল, বুকের মধ্যেও সহসা যেন একটা অব্যক্ত বেদনার যাতনা অনুভূত হইয়া ক্ষণিকের জন্য তাহাকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিল। কিন্তু অবিলম্বে প্রকৃতিস্থ হইয়া সে কহিল,—দেখুন, আজ থাক; কলকেতায় শুনেছি আপনার মত বেহ্মদত্যিরা বড়ঘরের ছেলেদের শিকার করবার জন্য ঘুরে বেড়ায়,—তারা রূপসী মেয়েদের ফটো দেখিয়ে, ছেলেদের ফাঁদে ফেলে, কল্‌কেতিয়া কায়দা কিনা! তা, আপনিও এক কাজ করুন না, আপনি যে বাবুদের কথা বলছেন, তাদের ফটো কাল আমাদের দেখিয়ে দিন। ফটো দেখে যদি আমাদের মনে ধরে, তাহলে কালই আপনার সঙ্গে সুড়সুড় করে—আর বলব না, আপনি বুঝে নিন।

রতনচাঁদ কহিল,—আমি যে বাবুদের কথা বলছি, তাঁদের চেহার চমৎকার—

নির্ম্মলা বাধা দিয়া কহিল,—চোখ ত সকলের সমান নয় মশাই, এখন

ধরুন—আপনার চমৎকার চেহারার বাবুরা যদি আমাদের চোখে না ধরে ?

রতনচাঁদ একটু যেন ঘুসড়াইয়া গিয়া কহিল,—যদি তাঁদের কাছে ফটো না থাকে ?

নির্ম্মলা কহিল,—কলকেতার বাবু, বিশেষ কাশীতে যখন শিকার খেলতে এসেছেন, ফটো সঙ্গে এনেছেন তাতে কোন্ সন্দেহ নেই।

রতনচাঁদ কহিল,—তাহলে কাল—

নির্ম্মলা কহিল,—হাঁ কাল, ঠিক সন্ধ্যার আগেই আমরা আসব, ঘোড়াঘাটে আপনার অপেক্ষা করব; কিন্তু এও বলে রাখছি মশাই, যদি আপনি বাবুদের লুকিয়ে সেখানে আনেন, তাহলে আমরা কুরুক্ষেত্র করব বলে রাখছি, বাবুদের কাছে ত যাবই না, আপনাকে পর্য্যন্ত সবার সামনে কাঁদিয়ে ছেড়ে দেব। বুঝছেন ত, আমরা নাককাটা সেপাই, সহজ মেয়ে নই।

রতনচাঁদও মনে মনে বুঝিতেছিল, এ পর্য্যন্ত সে এমন মেয়ে চক্ষেও দেখে নাই, সংস্পর্শেও আসে নাই; তত্রাচ তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কেননা কলকেতার এই শ্রেণীর শিকারী বাবুদের যে এই জাতীয়া রূপসীদের উপর একান্ত লালসা !

দাঁতে জিহ্বা কাটিয়া অপরূপ মুখভঙ্গী করিয়া রতনচাঁদ কহিল,—ছি, ছি! এ কি কথা! তোমাদের নিয়েই আমাদের কারবার; বাবুরা ত বসন্তের কোকিল, দুদিনের জন্য মজা লুঠতে কাশীতে এসেছে; তাদের খুসী করতে হবে বলে যে তোমাদের একবারে পথের ওপরেই ফাঁস করে দেব, এমন আহাম্মক আমি নই। আর পয়সার পিত্তেসে এ পথে পা বাড়িয়েছি সত্যি, কিন্তু আমি ঠিকের মানুষ, ক্রমেই আমার ব্যাভার দেখে

আমাকে মালুম করতে পারবে। আমি হাঙ্গামার ভেতরে নেই; ঘাটে আজকাল নানা রকমের মেয়ে আসে, কিন্তু একায করতে করতে মেয়েমানুষকে দেখলেই সে কোন্ চরিত্রের সেটা হদিস করবার হিম্মতটুকু এসে গেছে আমার।

নির্ম্মলা রতনচাঁদের কথায় একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে এইরূপ ভান করিয়া কহিল,—সত্যি, আপনার কথা শুনে আমরা অবাক হয়ে গেছি, এ পথের আপনি একজন সত্যিকার মহাজন! আচ্ছা, তাহলে এখন এই কথাই রইল।

এই সময় নৌকা মানমন্দিরের ঘাটের কাছেই আসিয়াছে দেখিয়া রতনচাঁদ বলিয়া উঠিল,—আপনারা তাহলে দশাশ্বমেধে গিয়ে নামুন, আমি এইখানেই নেমে পড়ি, আমার কাজ একটু আছে এখানে। ঘাটে নেমে একে একটা টাকা ভাড়া দিয়ে দেবেন। টাকা আছে কাছে?

নির্ম্মলা হাসিয়া কহিল,—তা আছে বই কি, আপনি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারেন।

নামিবার সময় রতনচাঁদ মাঝিকে একটি ইঙ্গিত করিয়া যাইতে ভুলিল না, তাহার অর্থ—ডিঙ্গিভাড়ার কমিশন বা দালালীর অর্দ্ধাংশ যেন সে তাহার জন্য রাখিয়া দেয়।

৬

পরদিন প্রাতে চা পানের পর নগেন্দ্রনাথ নির্ম্মলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার ট্রাঙ্কে আমার ফটো একখানা আছে না?

নির্ম্মলার বুকের উপর যেন একটা বুলেট আসিয়া পড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া নগেন্দ্রনাথের মুখের উপর কৌতূহলের দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—বোধ হয় আছে, কিন্তু এই সকালেই ফটোর কি দরকার?

নগেন্দ্রনাথ পূর্ব্বেই ইহার মহলা দিয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং অভিনেতার মত সহজেই উত্তর দিল—আমাদের এন, সি, চাটুয্যে কাশীতে এসে রামকৃষ্ণ ষ্টুডিও খুলেছে,—কাল রাত্তিরে দশাশ্বমেধে দেখা; বললে, পূজোর সময় যে ফটো তুলেছিলেম, কাছে থাকে ত একখানা কাল পাঠিয়ে দিও, এনলার্জ করে দেব, এখন একটু ফুরসত আছে।

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া নির্ম্মলা কহিল—ভালই ত। আচ্ছা খুঁজে দেব'খন।

ব্যগ্রতার সহিত নগেন্দ্রনাথ কহিল,—একটু কষ্ট করে এখনই যদি বার করে দাও ত বড় ভাল হয়, লক্ষীটি! প্রেমচাঁদ বসে আছে এখনও, ফটোখানা নিয়ে যাবার জন্যে।

অতি কষ্টে অন্তরের বহ্নি-জ্বালা সামলাইয়া লইয়া নির্ম্মলা সহজভাবেই কহিল,—এনে দিচ্ছি!

মানসপাপী পাপ গোপনের যতই ভান করুক না কেন, স্বাভাবিক

সংশয় সর্ব্বক্ষণই তাহাকে ত্রস্ত করিয়া তুলে; গুপ্তধনের রক্ষক বিধিমত উপায়ে তাহার ধন গোপন করিয়াও যেমন প্রতিক্ষণে গুপ্তস্থান ব্যক্ত হইবার আশঙ্কায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। নির্ম্মলার প্রশ্নে ও তাহার দৃষ্টির সংঘাতে নগেন্দ্রনাথের বুকের মধ্যেও একটা ছোটখাটো ঝাঁকুনি লাগিল।

বিচক্ষণ প্রেমচাঁদ সকল দিক দেখিয়া মানমন্দিরের একান্ত নির্জ্জন অংশে যে পোড়ো বাড়ীখানি ভাড়া করিয়াছিল, তাহার কাযের হিসাবে সেখানি বেশ উপযোগীই হইয়াছিল। হানা বাড়ী বলিয়া ইহার একটা অখ্যাতি থাকায় কাশীর কোনও অধিবাসী এ বাড়ীতে সংসার পাতিতে সাহস পাইত না, অধিকাংশ সময় বাড়ীখানি খালি পড়িয়া থাকিলেও, পূজা বা পর্ব্বাদির সময় বাড়ীর মালিক সে ক্ষতি পরিপূর্ণ মাত্রায় পূরণ করিয়া লন। তবে শুনা যায় যে, যাঁহারা এ বাড়ীতে আসিয়া অবস্থিতি করেন, তাঁহারা কেহই এখানে সুখী হইবার অবকাশ পান না, একটা না একটা বিভ্রাট বা হানি তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটিয়াই থাকে।

দুই মহলের বড় বাড়ী, অনেকগুলি ঘর; ঘরগুলি বেশ বড় বড় ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভিতর ও বাহির মহলের সংযোগস্থলে একখানি সুবৃহৎ হল-ঘর মধ্যমণিরূপে বাড়ীখানির সৌষ্ঠব বাড়াইয়াছে; বাড়ীর ভূতপূর্ব্ব মালিক নাকি নাচের উদ্দেশ্যেই এই ঘরখানি তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। তাই এই হলঘর নাচঘর নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

এই সুন্দর নাচঘরটির মধ্যেই নগেন্দ্রনাথের গুপ্ত বৈঠক বসিয়া থাকে। ঘরের ভিতর তিনখানি খাটিয়া পাঁতা, খাটিয়ার উপর ধোপদুরস্ত সাদা বোম্বাই চাদর ও একটি করিয়া তাকিয়া। মধ্যের বড় খাটিয়াখানির উপর নগেন্দ্রনাথ অঙ্গ ঢালিয়াছে, পার্শ্বের খাটিয়ায় প্রেমচাঁদ আড় হইয়া শুইয়া আছে; দরজার সান্নিধ্যে অপর খাটিয়াখানি সম্ভবতঃ অভ্যাগতদের জন্যই

নগেন্দ্রনাথ গলা ঝাড়িয়া কহিল,—আমরা হচ্ছি আপনাদেরই অনুগতজন. মুখ দুখানি দেখবার জন্যে চাতকের মত চেয়ে আছি।

প্রেমচাঁদ অধৈর্য্যভাবে বলিয়া উঠিল,—হুঁ, তবেই হয়েছে! এতদিন ধরে মেয়েমানুষ ঘেঁটে এখনও তাদের মেজাজ চিনলে না! লজ্জাবতীদের বাসনাটা কি জান, আমরাই ঘোমটা ওদের খুলে দিই, ওঠ না—

নগেন্দ্রনাথকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ঈষৎ বিরক্তির সহিত প্রেমচাঁদ কহিল,—তুমি যে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে রইলে দেখছি! আচ্ছা তাহলে আমিই উঠি—

কিন্তু প্রেমচাদকে আর উঠিতে হইল না,—তৎপূর্ব্বেই লজ্জাবতীরা একসঙ্গেই তাহাদের মুখ দুইখানি অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া দিল। প্রেমচাঁদ বিকট উল্লাস-ধ্বনি করিয়াই পর মুহূর্ত্তে আকস্মিক বিস্ময়াতঙ্কে মুহ্যমান হইয়া এলাইয়া পড়িল, তাহার মুখ শবের মত বিবর্ণ হইয়া গেল।

নির্ম্মলা যদিও প্রেমচাঁদের সম্মুখে বাহির হইত না, কিন্তু নগেন্দ্রনাথের সহিত তাহার একান্ত অন্তরঙ্গতা প্রবাসযাত্রার সহযোগিতাসূত্রে নির্ম্মলা তাহার নিকট নিতান্ত অপরিচিতা ছিল না, আর কাদম্বিনী প্রেমচাঁদের সম্মুখে আসিতে বা কথাবার্ত্তা কহিতে বড় একটা সঙ্কোচ করিত না; সুতরাং তাহাদের গুপ্ত বিলাস গৃহে নির্ম্মলা ও কাদম্বিনীর অবগুণ্ঠনমুক্ত দুইখানি মুখ প্রথমে প্রেমচাদের মনে বিভ্রম উপস্থিত করিলেও, পরক্ষণে তাহাদিগকে চিনিতে প্রেমচাঁদের বিলম্ব হয় নাই।

আর নগেন্দ্রনাথ,—আকুল আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ দুইটি চক্ষুর পূর্ণ দৃষ্টি আগন্তুকাদের অবগুণ্ঠনমুক্ত মুখ দুইখানির উপর পড়িবামাত্র সে বিদ্যুৎ-পৃষ্টবৎ আড়ষ্ট হইয়া পড়িল,—কয়েক মুহূর্ত্ত সেই ভাবে থাকিয়া সহসা বিহ্বলের মত বলিয়া উঠিল—য়ঁ্যা—তুমি!—নির্ম্মলা!

রতনচাঁদ দুই বাবুকে একসঙ্গে হতভম্ব হইতে দেখিয়া মনে মনে বুঝিয়া লইল যে তাহার আনীত শিকার দুইটি ইহাদের নিকট অপূর্ব্ব বা অপরিচিত নহে।

মুহ্যমান নগেন্দ্রনাথের মুখের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্ম্মলা কহিল,—তারপর ?

পরক্ষণে বস্ত্রমধ্য হইতে পূর্ব্বের ফটোখানি বাহির করিয়া নগেন্দ্রনাথের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কহিল,—এই ফটোখানাই বুঝি এই ভাবে রামকৃষ্ণ ষ্টুডিওতে এনলার্জ হচ্ছে ?

নগেন্দ্রনাথ নির্ব্বাক, নিরুপায়ভাবে একবার শুধু প্রেমচাঁদের দিকে চাহিল। প্রেমচাঁদের তখন ইচ্ছা হইতেছিল, সেখান হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায় ; কিন্তু দরজার সম্মুখেই নির্ম্মলা এমন অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল যে, তাহাকে না সরাইয়া দিয়া যাইবার উপায় নাই। অগত্যা সে পরিত্রাণের আশায় শেষ অস্ত্র ত্যাগ করিল,—সহসা দন্তবিকশিত করিয়া বলিয়া উঠিল,—খেলতে বসে তুমিও যে মাত হয়ে গেলে হে ! বউদিকে সব বল, ওঁকে অবাক করে দেবার জন্যে আমরা আগে থাকতেই এসব করে রেখেছি—

প্রেমচাঁদের কথায় নির্ম্মলার সর্ব্বশরীর এবার জ্বলিয়া উঠিল। সে তীক্ষ্ণস্বরে কাদম্বিনীকে কহিল,—কাদি, দেখ ত এ ঘরে ঝাঁটা আছে কি না !

দরজার পাশেই একগাছি সৌখীন গোছের সম্মার্জ্জনী পড়িয়াছিল। কাদম্বিনী তাহা সংগ্রহ করিয়া কহিল,—পেয়েছি দিদিমণি, তবে নারকল কাটির ঝাঁটা নয়,—খেজুর ঝাঁটা—

নির্ম্মলা কহিল,—এই ঝাঁটা দিয়ে ঐ পোড়ারমুখো মিন্সেকে আগা-পাছতলা পেট্ ত তুই একবার, আমার গায়ের জ্বালা জুড়ুক—

কাদম্বিনীকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া নির্ম্মলা গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল,—তুই যদি না আমার কথা শুনিস্, তাহলে ঐ ঝাঁটা দিয়ে আগে তোকে সজুত করব, তারপর—

আর বলিতে হইল না! কাদম্বিনী নির্ম্মলাকে বেশ-চিনিত। প্রেমচাঁদের উপর তাহারও একটা বিদ্বেষ ও রাগ বরাবর ছিল,—বিনা-বাক্যব্যয়ে সে সেই ঝাঁটার দুই তিন ঘা প্রেমচাঁদের অঙ্গে যখন উপর্য্যুপরি বর্ষণ করিল, তখন নগেন্দ্রনাথ কাতরভাবে বলিয়া উঠিল,—ওকে মেরে লাভ কি নির্ম্মলা,—কাদি—

আহত প্রেমচাঁদ তখন আড়ষ্টভাবে বন্ধুর পশ্চাতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। এতটা যে হঠাৎ হইবে তাহা সে কল্পনাও করে নাই।

নির্ম্মলা নগেন্দ্রনাথের সেই ভয়কাতর মুখের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল,—আজ তোমার পরিবার যদি তোমার মত গুণধর স্বামীর আদর্শ নিয়ে এই রকম কীর্ত্তি সত্যই করত, তাহলে তোমার মুখখানা খুব উজ্জ্বল হ'ত, কেমন? আজ যদি তোমার বাবা থাকতেন বা আমার বাবা থাকতেন, তাহলে ঐ জানোয়ারটার মতন তোমাকেও শিক্ষা দিতে আমি উপরোধ করতেম; এখন তুমি বাড়ীর কর্ত্তা, তোমার সাতখুন মাপ হ'লেও এতটা অত্যাচার, এত বড় অনাচার আমি কখনও বরদাস্ত করতে পারব না এটা জেনে রেখো।

নগেন্দ্রনাথ ছলছল চক্ষুতে নির্ম্মলার দৃপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল,—আমাকে ক্ষমা কর নির্ম্মলা! আমি এখন বুঝতে পারছি কত বড় অন্যায় আমি করেছি, সত্যই আমি শাস্তি পাবার মত গর্হিত কায করে ফেলেছি; কিন্তু আমি আজ শপথ করে বলছি নির্ম্মলা, আর কখনও এমন কায করব না; শুধু এই নয়,—যাতে তোমার বিদ্বেষ ও

অনিচ্ছা, সে সমস্তই আমি আজ থেকে ছেড়ে দিলেম। আমাকে বিশ্বাস কর নির্ম্মলা—

নির্ম্মলা ধীর কণ্ঠে কহিল,—তোমাকে আমি এখন বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু ঐ জানোয়ারটাকে আমার বিশ্বাস হয় না,—তুমি ত এরকম ছিলে না, কে তোমাকে আজ নরকের পথে জোর করে টেনে নিয়ে চলেছে, তা জানতে আমার বাকি নেই।

নগেন্দ্রনাথ মনে মনে কি ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—বেশ, আজ থেকে আমি প্রেমচাঁদের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করলেম।

প্রেমচাঁদ তখন বিকৃত মুখে নগেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিল, নগেন্দ্রনাথ অসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিল,—তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ রইল না, যদি তোমার একটুও মনুষ্যত্ব থাকে, আমার ত্রিসীমানায়ও তুমি আর এস না। তোমার কাছে আমার যে টাকা আছে, আমি তার হিসেব চাই না, টাকাও চাই না, এইটুকু শুধু চাই—তুমি আমায় ত্যাগ কর,—এই রাত্রেই তুমি কলকেতায় ফিরে যাও।

প্রেমচাঁদের মুখখানি হঠাৎ যেন মসীলিপ্ত হইয়া গেল। হতভম্বের মত সে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে সেই কক্ষের মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

রতনচাঁদ এই সময় পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সে নির্ম্মলার দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। নির্ম্মলা তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টে চাহিয়া রূঢ়স্বরে কহিল,—পালাবার মতলব করছ বটে? তোমার এখন হয়েছে কি? তোমাকে জেল খাটিয়ে তবে ছাড়ব!

জেলের নামে রতনচাঁদের মুখখানি ভয়ে ফ্যাকাশে হইয়া গেল, তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, উচ্ছ্বসিত আর্ত্তস্বরে সে হাত দুইখানি যুক্ত করিয়া

কহিল,—দোহাই মা, আমাকে মারবেন না,—আমি অতি হতভাগা, পেটের দায়ে এ পথে এসেছি মা—

তর্জ্জন করিয়া নির্ম্মলা কহিল,—পেটটা কি এতই বড় যে তা পোরাবার জন্যে ভদ্রলোকের মেয়েছেলেদের জাত-কুল মজাবার ব্যবসা ধরতে হবে? এর চেয়ে চুরি-ডাকাতিও অনেক ভাল ছিল যে! গলায় দেবার দড়িও জোটাতে পার নি? ইতর—নচ্ছার—নরপশু! মুগুর দিয়ে তোমার মাথা গুঁড়লেও রাগ যায় না! কাদি,—এরও পিঠে যা কতক—

অতি ভয়ে বিহ্বল হইয়া রতনচাঁদ ক্রন্দনের সুরে বলিয়া উঠিল,—মেরোনা মা মেরোনা, চেহারা ত দেখছ মা,—আমার দুর্ভাগ্যের কথা আগে শোন মা, তারপর ঝাঁটা মারতে হয়, জেলে দিতে হয়, যা খুসী হয় ক'র!—মাগো, দুনিয়ায় আমার আপনার বলতে কেউ নেই; বয়স যখন দশ এগারো বছর, তখন মা মারা যান; মুড়ি ভেজে, তাই বিক্রী করে আরো কত কি কায করে মা আমায় পালতেন। শুনেছিলুম, মা ভালঘরেরই মেয়ে ছিলেন, অল্প বয়সে বিধবা হন, শেষে এক বড়লোক তাঁকে কুসলে কাশীতে আনেন। কাশীতেই আমি জন্মাই, আমার জন্মদাতা আমার জন্মের পরই নাকি মাকে ফেলে দেশে পালিয়ে যান, মা আমার কাশীতেই পড়ে থাকেন। মার মৃত্যুর পর আমি একেবারে পথে দাঁড়ালুম. কাশীতে আমার মত হতভাগার অভাব নেই: দলে মিশে পড়লুম, পকেটমারা থেকে আরম্ভ করে যত কিছু গর্হিত কায হতে পারে, সবই সাধতে লাগলুম; কতবার ধরা পড়েছি, বেদম মার খেয়েছি, কিন্তু কিছুতেই পেছপাও হইনি। শেষে এই রাস্তায় এসে নেমেছি। এতেও হাতেখড়ি দিয়েছেন—হদীস বলে দিয়েছেন ঐ প্রেমচাঁদবাবুর মত কলকেতিয়া ঘুঘুরা! এ পথে এসে কত কাণ্ডই করেছি মা, কিন্তু আজকের মত এমন

নাকাল কখনও হইনি, এমন বিপদে কখনও পড়িনি, আর হাতে হাতে এমন শিক্ষাও কখনও পাইনি ! কিন্তু মা, তুমি আজ চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাকে আক্কেল দিয়েছ—তোমার সামনে দিব্যি করছি মা, এমন কাজ আর কখনও করব না !—এতদিন পশু ছিলুম, আমি এবার মানুষ হব ।

নির্ম্মলা রতনচাঁদকে শুধু মার্জ্জনা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাকে মানুষ হইবারও অবকাশ দিয়াছিল । রতনচাঁদের ন্যায় হতভাগ্য, দুষ্কৃতি-পরায়ণ, জাতির আবর্জ্জনা-স্বরূপ নরপশুদেরও যে মানুষ করিয়া তুলিতে পারা যায়, এ বিশ্বাস নির্ম্মলার প্রচুর ছিল । তাই নির্ম্মলার পরামর্শ ও সহায়তায় রতনচাঁদ নিজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া—পূর্ব্বের খোলস ছাড়িয়া বাঙ্গালীটোলায় এক দোকান খুলিয়া বসিল । আজ সে কাশীর একজন বড় দোকানদার এবং তাহার প্রতিষ্ঠাও প্রচুর ।

নগেন্দ্রনাথও তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিল । আর রেসের ময়দানে কেহ কখনও তাহাকে দেখে নাই, প্রেমচাঁদের সহিত সে আর কখনও মিশে নাই ; এখন নির্ম্মলাকে সঙ্গে না লইয়া সে গড়ের মাঠে হাওয়াটিও পর্য্যন্ত খাইতে বাহির হয় না !

*　　*　　*

ভারতের ভগবতীদের এইভাবে জাগৃতিই দুর্গত তন্দ্রাতুর জাতির জাগরণ ও মুক্তি !

সমাপ্ত